আগষ্ট বিপ্লব

(১৯৪২)

(বাংলা ও আসাম)

প্রথম খণ্ড

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

প্রথম সংস্করণ

জাতীয় সপ্তাহ, এপ্রিল, ১৯৪৬

হিন্দুস্থান বুক ডিপো ১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; বেঙ্গল ইউনাইটেড
ট্রেডার্স লিঃ এর মুদ্রণ বিভাগে [ম্যাগনেট প্রেস]
৩৫ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাম দুই টাকা

উৎসর্গ

বিপ্লবের হোমানলে যে সকল বাংলা
ও আসামের বীরগণ জীবন উৎসর্গ
করিয়াছেন তাঁহাদের পবিত্র
স্মৃতির উদ্দেশে

আগষ্ট বিপ্লবে গুলীতে নিহত

শহীদের রক্তে রঞ্জিত ভূমি

—:o:—

কলিকাতা	...	...	...	২০ জন
কাঁথি	...	...	...	১৩ জন
তমলুক	...	...	...	৩২ জন
দিনাজপুর	...	...	...	৪ জন
বোলপুর	...	...	...	৫ জন
শিলিগুড়ি	...	...	...	৪ জন
ঢাকা	...	...	...	৬ জন
ভাঙ্গা	...	...	...	১ জন
আঠারবাড়ী (ময়মনসিংহ)		...	...	৩ জন

সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ নিহতদিগের মধ্যে দুইজন মহিলা। একজন তমলুকে আর একজন কলিকাতায় নিহত হইয়াছেন।

ইহা ব্যতীত ঢাকা জেলের ভিতর সাধারণ বন্দীদিগের উপর গুলী চালনা করা হয়। ইহার ফলে ৪০ জন বন্দী নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ ঘোষিত হয়।

———

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা বোম্বাই অধিবেশনে "ভারত ছাড" প্রস্তাব গ্রহণের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোহিতগণ যখন একে একে কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। সবার অলক্ষ্যে সমগ্র ভারতে ধূমায়িত বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই বিপ্লব রাজদ্রোহিতা বা বিদেশী শাসনতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ মূলক নয়। বন্দীজীবনের শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য শুধু মানুষ নয় পিঞ্জরাবদ্ধ অসহায় পাখীও যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে। ঠিক তেমনি ভাবেই সমগ্র ভারতের গণ জীবনে মুক্তির নেশা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিপ্লবের রূপে দেখা দিল। সে বিপ্লবের নিখুঁত ইতিহাস ও তাহার প্রত্যেকটি ঘটনার যথাযথ সংবাদ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই বা তাহা সম্ভবও ছিল না।

ইদানীং কয়েকজন বিশিষ্ট দেশকর্ম্মীর প্রচেষ্টায় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল তথ্য অবলম্বন করিয়া আগষ্ট আন্দোলনের কথঞ্চিৎ প্রামাণিক ইতিহাস সংকলন করিবার চেষ্টা করিলাম। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিব। যদি কোন সহৃদয় পাঠক অন্য কোন ঘটনার সঠিক বিবরণ ও আলোক চিত্র বা অন্য কোন নিদর্শন পাঠাইয়া এই সংকলন কার্য্যে সহায়তা করেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত সেই সকল তথ্য পরবর্ত্তী সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিব।

জাতীয় সপ্তাহ
এপ্রিল, ১৯৪৬

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলায় আগষ্ট আন্দোলন জনসংগ্রামের রূপে ব্যাপক ভাবে যদিও প্রকাশ লাভ করে নাই, তথাপি বাঙ্গলার জনসাধারণের মনের উপর দিয়া এই আন্দোলনের আবেগ বহিয়া গিয়াছে, বাঙ্গলার জনসাধারণের চিত্তে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইবার যে স্পৃহা বাঙ্গলা দেশকে ১৯০৫ সন হইতে বৈপ্লবিক চেতনায় নিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা আগষ্ট বিদ্রোহে প্রচণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিত সন্দেহ নাই। প্রকৃতির রুদ্ররোষ ও করাল দুর্ভিক্ষ বিরাট প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গলার কয়েকটি স্থানে এই আন্দোলন সত্যিকারের গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে মেদিনীপুরের আন্দোলনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আভাষ দেখা দিয়াছিল। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার ও বিদ্যুৎবাহিনী প্রভৃতি সঙ্ঘের তৎপরতা বাঙ্গলা তথা ভারতের গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। জলোচ্ছাস বন্যা ও ঝটিকা ইত্যাদি প্রকৃতির রোষে পড়িয়াও মেদিনীপুরের গরীব জনসাধারণ জাতীয় পতাকার মর্য্যাদাকে সর্ব্বাগ্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রাণ পণ করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের হয়ত ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য জীবন বলি দিবার আগ্রহে ও চরম ত্যাগ স্বীকারে মেদিনীপুরের জনসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে মৃত্যুর পরিব্যাপ্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়াও ইহারা নত হয় নাই। ৭৫ বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা জাতীয় পতাকার সম্মুখে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়াছে।

কচি ছেলে প্রাণ দিয়াছে! এই মেদিনীপুরেই পীড়িত নিরন্নের মৃতদেহ শৃগালে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে এবং বস্ত্রাভাবে কুলনারী আত্মহত্যা করিয়াছে! এই দুঃসহ ক্লেশের দাহনে পুড়িয়া শুধু মেদিনীপুরের আত্মা একটি গুণে সোনা হইয়া রহিয়া গিয়াছে; তাহা তাহার দেশপ্রেম।

বাংলা দেশের কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে ও আগষ্ট বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বহু লাঠি চার্জ হইয়াছে গুলি চলিয়াছে গ্রেপ্তার হইয়াছে, কারাদণ্ড হইয়াছে এবং পাইকারী জরিমানা হইয়াছে। রাণাঘাটের নিকট জনতার উপর বিমান হইতে মেশিনগান চালাইবার সংবাদ শুনা গিয়াছে।

আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসী একটি নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহা হইল স্বাধীনতার দাবীতে সংগ্রাম যখন আরম্ভ হয় তখন জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি ঐক্য দেখা যায়, অন্য কোন সময় বড় হইয়া চোখে পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মুসলমান সম্প্রদয়ের অগ্রণী মিঃ জিন্না মুসলমান সম্প্রদায়কে আগষ্ট আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে কয়েকটি আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন দেখা গিয়াছিল তৃতীয় পক্ষের দালারেরা চেষ্টা করিয়া সাম্প্রদায়িক দাবী চালাইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘ গুলির ব্যাপক প্রচার কার্য্যে এক শ্রেণীর দেশবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করিলেও দেখা যায় যে, আগষ্ট আন্দোলনের সময় তাহা একেবারে বিফল হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মুসলমান আগষ্ট আন্দোলনে দেখা গিয়াছে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই—কোন মুসলমান ইহাকে হিন্দুর সংগ্রাম মনে করে নাই। মুসলমান সম্প্রদায় বিরোধিতা তো করেই নাই বরং অনেক ক্ষেত্র নিরপেক্ষ থাকিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল।

আগষ্ট আন্দোলনে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা অন্তরে পৌঁছিয়াছে, ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ হয় নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, নারী, গ্রামবাসী ও সহরবাসী শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র এবং কিশোরদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতার স্পৃহা জাতির একটি বৈপ্লবিক স্বত্ত্বা গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। ভবিষ্যতে যে কোন আন্দোলন গ্রহণ ও পরিচালন করিবার দায়িত্ব ও কুশলতা জনসাধারণ যে লাভ করিয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

জাতীর জীবনে আসিয়াছে শঙ্কাহীনতা। 'করিব অথবা মরিব'—এই বাণী জাতির জীবনে সফল হইয়াছে। নিরস্ত্র জাতির অভ্যুত্থানের একমাত্র পথ, অন্যায় প্রতাপের দম্ভকে অস্বীকার ও তুচ্ছ করা, সশস্ত্রের বিদ্রোহ অপেক্ষা নিরস্ত্রের বিদ্রোহ ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতায় বেশী ঐশ্বর্য্যবান এবং ঢের বেশী শৌর্য্যময়। বাঙ্গালা দেশেও ইহার অভাব নাই। অন্যায় যদি কামান বন্দুক লইয়াও হুমকি দিতে আসে, তবু জনসাধারণ আর ভয় পায় না; পিছাইয়া যাইতে প্রস্তুত নহে। আগষ্ট আন্দোলনের ফলে জাতির চেতনায় এই এক নূতন ঐশ্বর্য্য গড়িয়াছে। চাষী, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতির মধ্যে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সম্পূর্ণ অহিংসভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং মৃত্যু বরণ করিয়াছে। ইহারা কোনকালে অহিংসার দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন না বা সেইরূপ আদর্শ কায়মনে পালন করিতেন না। কিন্তু সংগ্রাম পরীক্ষায় ইঁহারা সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে নিজেদের বিদ্রোহ ও ব্যক্তিত্বকে জাহির করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক সত্যই নূতন করিয়া প্রমাণিত হইতেছে যে জাতির জীবনে অহিংসার আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে অথচ অতি গভীররূপে গ্রহণ করিয়াছে। 'করেঙ্গে-য়্যা

মরেঙ্গে” (Do or die) তাহারই প্রতিধ্বনি, তাহার পর আজও নূতন করিয়া দেখিতে পাই সশস্ত্র আজাদ হিন্দ ফৌজেরও ধ্বনিতে সেই আত্মবলিদানের প্রেরণা স্ফুরিত হইতেছে, ইত্তিফাক্ ইত্‌মদ ও কোরবানী। ভারতের সশস্ত্র জাতীয় সিপাহীও হত্যা করিতে চায় না। আজাদীর জন্য সে নিজেকে কোরবানী দিতে চায়।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ভারতীয় জনগণ যে অপূর্ব্ব সাহস, ধৈর্য্য ও তিতীক্ষার পরিচয় দিয়াছে তাহা ইতিহাসে সত্যই অতুলনীয়। বিদেশীর শাসন যন্ত্র এই সব গৌরবময় ইতিহাসের কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত্তই সক্রিয়। বিদেশী শাসকবর্গ তাহাদের শাসনের অযোগ্যতা, তাহাদের শাসন যন্ত্রের নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপের কাহিনী লোক চক্ষের অন্তরালে রাখিবার জন্য ভারতরক্ষা আইনের অজুহাতে মুদ্রাযন্ত্রের কঠোর নির্দ্দেশ এতদিন বর্ত্তমান ছিল। এই নির্দ্দেশ এখন শিথিল হওয়ায় যে সত্য এতদিন অন্তর্নিহিত ছিল তাহা এখন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানের অত্যাচারের কাহিনী নিম্নে দেওয়া হইল।

মেদিনীপুর

১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন ও তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্থানীয় অধিবাসীদের উপর নির্ব্বিচারে সরকারী পীড়ন সম্বন্ধে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত, মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এডভোকেট শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস এবং তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও মহিন্দ্র রিলিফ কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া যে

রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইল।

রিপোর্টে দেখা যায় যে আন্দোলন দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে গুলী বর্ষণ, নারী ধর্ষণ, পাইকারী জরিমানা বাদে শিশুরাও এই দমন ব্যবস্থা হইতে রেহাই পায় নাই; শাস্তি হিসাবে কাহাকেও কাহাকেও দুরন্ত শীতের রাত্রে পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে লোককে উলঙ্গ করা হইয়াছিল, প্রহারের ফলে একজনের প্রস্রাবনালী দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল, বৃদ্ধা ও গর্ভবতীরাও চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিহতদের মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজনের হাতে না দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। এই রিপোর্টের সমস্ত দায়িত্ব উপরোক্ত চারজনই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই রিপোর্ট বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনাই সত্য।

তমলুক মেদিনীপুর জেলায় একটি মহকুমা। উহার এলাকায় ছয়টি থানা আছে। যথা—সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া। এই মহকুমার মধ্যে কেবল তমলুক সহরেই মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সহরের লোকসংখ্যা ১২ হাজার। তমলুক মহকুমায় ৭৬টী ইউ-নিয়ন আছে এবং ১২৪৬টি গ্রাম আছে। সমগ্র মহকুমায় ১৪২২০০টি পরিবারে মোট ৭৫৩১৫২ জন লোক বাস করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির অধীনে তমলুকে একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি ও ছয়টি থানা কংগ্রেস কমিটি ছিল। সবগুলি কংগ্রেস কমিটিই সক্রিয় ও সুসংহত ছিল। থানা কংগ্রেস কমিটি গুলির অধীনে ৫২টী প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি ছিল। প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলি প্রতিটি ইউনিয়নে স্থাপিত ছিল। ৪টি

থানা কংগ্রেস কমিটির নিজস্ব আফিস ঘর ছিল। অপর দুইটি থানা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় ভাড়া-করা বাড়ীতে ছিল।

ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই এখানে ভারত-রক্ষা আইন প্রযুক্ত হয়। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। ফলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের গণসংযোগ কার্য্য খুব কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জেলার নূতন করিয়া সেস্ নির্দ্ধারণের ন্যায় অরাজনৈতিক কাজেও কংগ্রেস কর্ম্মীদের সভা আহ্বান করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই সময় মহকুমা-কর্ম্মীরা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কয়েকজন কর্ম্মীকে ট্রেণিং লওয়ার জন্য ওয়ার্দ্ধা এবং অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে খদ্দর উৎপাদন এবং কাগজ তৈয়ারী প্রভৃতি কুটীরশিল্প সমন্ধে ট্রেণিং দেওয়া হয়। সুতাহাটা গান্ধী আশ্রমে দুইমাস একটি নারীশিক্ষা শিবির চালানো হয়। খাদির উপরই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। বিভিন্ন থানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে খাদি কেন্দ্র খোলা হয়। ৩০ মণ কার্পাস বীজ আনিয়া বণ্টন করা হয়। ৪০০ মণ তূলা বিক্রয় ও বণ্টন করা হয়। ৩৫০০ কাটুনী নিজের ও পরিবারের জন্য খাদি তৈয়ার করেন। তাহা ছাড়া খাদিকেন্দ্রে ৪০০০ কাটুনী সুতা কাটিয়া অর্দ্ধেক সুতা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করেন। অধিকাংশ কাটুনীই স্ত্রীলোক।

এই মহকুমায় ৯টি হরিজন বিদ্যালয় ছিল। এগুলির বেশীর ভাগই মহাত্মা গান্ধীর হরিজন বোর্ড হইতে সাহায্য পায়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ২টি নৈশ বিদ্যালয় ছিল। হিন্দী ভাষার বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সেখানে পাঠ গ্রহণ করিতেন। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই মহকুমার ৫টি কেন্দ্রে শিক্ষকের কাজ করিতেন।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে মহাত্মা গান্ধী যখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তন করেন, তখন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাসদেবপুর গান্ধী আশ্রমে সত্যাগ্রহ করেন। তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁহার পরে মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র জানা সত্যাগ্রহ করার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে মোট ৩৬ জন গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হন। বহু সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ করিয়াও গ্রেপ্তার হন নাই। মুক্তি পাইয়াই আবার সত্যাগ্রহ করেন। দুই জন কর্ম্মী সত্যাগ্রহ করার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তাঁহারা পথিমধ্যে গ্রেপ্তার হন। এই সকল গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড লোকের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

বঞ্চনা নীতির ফলে দুর্ভোগ

জাপানী অভিযানের আতঙ্কে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চলসহ তমলুক মহকুমাকেও বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অধিকাংশ মোটর যান মহকুমা হইতে সরাইয়া ফেলা হয়। বাকী যে কয়খানি মোটর চলিত সেগুলিও যথেষ্ট তৈল পাইত না। আতঙ্কগ্রস্ত কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি নির্ম্মম ঔদাসিন্য দেখাইলেন। মোটর বাসের অভাবে তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না।

১৯৪২ সালের ৮ই এপ্রিল আর একটি নির্ব্বোধজনোচিত আদেশ আসিল। দায়িত্বহীন কর্ত্তৃপক্ষ সকল শ্রেণীর নৌকা সরাইয়া ফেলিতে চাহিলেন—পাছে জাপানীরা ঐগুলি ব্যবহার করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন, সমগ্র কাঁথি মহকুমা এবং তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার এলাকা হইতে সব রকম নৌকা ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, নৌকাগুলি ৩০ হইতে ৯০ মাইল দূরে নেওয়ার আদেশ

হইল। এই অসম্ভব আদেশ পালন করা অসাধ্য। ইহাতে শুধু দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষের দরজা খুলিয়া গেল। শত শত নৌকা পুড়াইয়া ফেলা হইল, নষ্ট করা হইল। এই নিষ্ঠুর কাজে গভর্ণ-মেণ্টের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল জানি না, অসংখ্য লোক জীবিকার একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সেখানে গিয়া সরকারী নীতির সমর্থন করিলেন এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামমাত্র হইয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মোটেই দেওয়া হয় নাই।

তাহার পরে আর একটি আদেশ আসিল—এবার সাইকেল সরানের আদেশ। পূর্ব্বের আদেশের মতই ইহা পীড়নমূলক। সমগ্র নন্দীগ্রাম, সুতা-হাটা মহিষাদল ও ময়না থানা এবং তমলুক ও পাঁশকুড়া থানার বেশীর ভাগ অঞ্চল হইতে সমস্ত সাইকেল সরাইয়া ফেলা হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নামমাত্র। সাইকেল মালিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন পান ৮ আনা হইতে ৫ টাকা এবং শতকরা ৫০ জন পান ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা। গড়ে ১২ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে এত কম লইতে অস্বীকার করেন, এই সকল অর্থহীন বঞ্চনা নীতিতে আর কিছু লাভ হয় নাই, কেবল যে শাসন ব্যবস্থা এই সকল দুর্গতির কারণ, লোকের মনে তাহাকে লোপ করার সঙ্কল্পই বর্দ্ধিত হয়। জাপ অভিযানের আতঙ্কে অভিভূত দায়িত্বহীন কর্ত্তৃপক্ষ লোকের দুর্গতির দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বঞ্চনা নীতি চালান।

কর্ত্তৃপক্ষের বাতুলোচিত কার্য্য দেখিয়া এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ জাপানীদের দেখা মাত্র আমাদিগকে ভাগ্যের হাতে ফেলিয়া পলায়ন করিবেই। সুতরাং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী গঠন করা হইল। সুতাহাটা ও মহিষাদল-এ বিষয়ে অগ্রণী হইল। এই দুই থানায় "বিদ্যুৎ বাহিনী" নামে দুইটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। এক মাসে তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়। শীঘ্রই তাহাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে উঠিল। তাহাদের মধ্যে ৫০জন স্বেচ্ছাসেবিকাও ছিলেন। এই সকল স্বেচ্ছাসেবককে ট্রেণিং দেওয়ার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল। সুতাহাটায় একটি "ভগিনী সেনা শিবির" স্থাপিত হয়। এই শিবিরগুলিতে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরা সময়ে কাজ করার জন্য নেওয়া হয়। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ [কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য], ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তমলুক মহকুমা পরিদর্শন করিয়া জনসাধারণের মনে প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বহু টাকা ও ধান চাউলও সংগৃহীত হয়। আমাদের কর্ম্মীরা জনসাধারণকে সকল রকম অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য নির্ভিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। তাহা ছাড়া অধিক ফসল জন্মাইতে, স্বদেশী ব্যবহার করিতে এবং মহকুমার বাহিরে খাদ্য শস্য চালান হইতে না দিতে বলেন।

তমলুক মহাকুমায় ১৯৪১ সালে যে খাদ্য শস্য ঘাটতি পড়িবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম এবং তাহা প্রমাণও করিয়াছিলাম। আমরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেলাম। জেলার সেই আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তা আমাদের কথা কানেই তুলিলেন না। আমরা মহকুমা হইতে ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে এবং বাহির হইতে ধান চাউল আমদানী করিয়া খাদ্যাবস্থার উন্নতিসাধন করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত ত করাই হইল না, পক্ষান্তরে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ আতঙ্ক সৃষ্টির নীতি অবলম্বন করায় ধান চাউল রপ্তানীতে উৎসাহই দেওয়া

হইল। কংগ্রেসকর্ম্মীরা প্রতিবাদ করিলেন, ফলে তাঁহাদিগকে নানা অজুহাতে জেলে দেওয়া হইল। যিনিই জেলা জজের কাছে আপীল করিলেন, তাঁহাকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভারতরক্ষা আইন রহিয়া গেল। তিনজনকে ঐ আইন বলে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। ধান-চাউল রপ্তানী লইয়া সরকারের সহিত আমাদের সঙ্ঘর্ষ মহিষাদল থানার এলাকায় দণীপুরে চরম রূপ পরিগ্রহ করিল।

প্রথম পুলিশের গুলী

১৯৪২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জনৈক পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনেষ্টবলসহ দণীপুরে গিয়া চাউলের কলের মালিকদিগকে চাউল রপ্তানী কার্য্যে সাহায্য করিলেন। প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী সমবেত হইয়া রপ্তানী বন্ধ করিতে চাহিল। পুলিশ গুলী চালাইল। ৩জন নিহত হইল; মহকুমায় এই প্রথমবার পুলিশের গুলী চলিল। ঘটনার সময় কংগ্রেসের কোন স্বেচ্ছাসেবক সেখানে ছিলেন না। গ্রামবাসীরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পুলিশের কাজে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। জনতা সরিয়া যায় এবং আট মাইল দূরবর্ত্তী কংগ্রেস কার্য্যালয়ে খবর দেয়। অতঃপর ৪০ জন সেচ্ছাসেবক চাউলের কলে আসে। তাহাদের পিছনে ছয় হাজার গ্রামবাসীও আসে। এই সময়ে তমলুক সহর হইতে তমলুকের একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ৪০ জন সশস্ত্র কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কংগ্রেসী সেচ্ছাসেবকেরা চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে বলেন এবং মৃতদেহগুলি দাবী করেন। কিছুক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর কর্ত্তৃপক্ষ ময়না তদন্তের পর তমলুকে শবগুলি প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই। জনসাধারণের হাতে মৃত দেহগুলি না দিয়া ঐগুলি নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কয়েকজন গ্রামবাসী নদী হইতে শবগুলি উত্তোলন করেন কিন্তু পুলিশ সেগুলি কাড়িয়া লয়। পরে

তাহারা একই চিতায় তিনটি শব পুড়াইয়া ফেলে। পরদিন জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী পার্শ্ববর্ত্তী ৬টি গ্রামে হানা দিয়া প্রায় ২০০ নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করেন। সারাদিন তাহাদিগকে রৌদ্রে বসাইয়া রাখা হয়। তাহাদিগকে কোন খাদ্য দেওয়া হয় নাই। মাত্র ১৮জনকে চালান দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের দেড় বৎসর হইতে ২ বৎসরের কারাদণ্ড হয়। চাউলের কলের মালিকদের জনমতের নিকট নতি স্বীকার করতে হয়। তাঁহাদিগকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা দিয়া দেওয়া হয়। জরিমানা হইতে দেড় হাজার টাকা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়, চাউলের কলের মালিকরা চাউল রপ্তানী করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আর রপ্তানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি হন।

এইভাবে মহকুমা হইতে ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে কংগ্রেস যে চেষ্টা করে, তাহা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। অবশেষে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ধান রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন জারী করেন। আগষ্ট বিপ্লব আরম্ভ হইলে এই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। কংগ্রেস পিকেটিং করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে রপ্তানী বন্ধ করে। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর যে ঝড় হয়, তাহার পরে ধান চাউল রপ্তানী নিষেধ করিয়া আর একটি আদেশ জারী করা হয়। এইভাবে গভর্নমেণ্ট ধান চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে অনিশ্চিত ও অব্যবস্থিত নীতি অবলম্বন করায় এই অঞ্চলের জনসাধারণের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কংগ্রেস তথ্য ঘাঁটিয়া পূর্ব্বেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে, খাদ্য শস্যে ঘাটতি পড়িবে, সেইজন্য কংগ্রেস ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ করায় এবং আমদানীতে উৎসাহ দেওয়ার নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। যাহাদের ঘরে উদ্বৃত্ত ধান ছিল, তাহাদিগকে উহা ন্যায্য মূল্যে স্থানীয় লোকদের নিকট বিক্রয় করিতে এবং বহুক্ষেত্রে বিনা সুদে ধারে বিক্রয় করিতেও অনুরোধ করে এবং সেই অনুরোধে ফলও হয়।

জেলার অন্যান্য অংশসহ তমলুক মহকুমাও এক বিরাট বারুদস্তূপে পরিণত হয়। তাহাতে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে অগ্নিসংযোগ এই স্তূপে হইল। কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর দমন নীতির ফলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সাধারণের বিরোধিতা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে নূতন সেস ধার্য্য হইল। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। জনমতের টুঁটি চাপিয়া ধরা হইল। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং জোর করিয়া সকল শ্রেণীর লোককে সমর ঋণপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য করা হইল। ধনী-দরিদ্র, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উকিল, দোকানদার, নৌকার মাঝি, গরীব চাষী কেউ বাদ পড়িল না। সমর ঋণপত্র ক্রয় করিতে এবং যুদ্ধের চাঁদা দিতে সকলের উপর সমান চাপ দেওয়া হইল। মহকুমার কোথাও যানবাহন নাই, নৌকা, সাইকেল, বাস সব সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই বিপজ্জনক নীতির ফলে মহকুমার উপর অনিবার্য দুর্ভিক্ষের করাল রূপ দেখা দিল। এই সব কাজের ফলে লোকের মনে বৃটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল, বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য লোকের সঙ্কল্প ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল।

অসংখ্য সভার অনুষ্ঠান হইল। আলোচনার বিষয় যুদ্ধের অবস্থা, বোম্বাই প্রস্তাব ও অহিংস বিপ্লব। এক একটি সভা ও শোভাযাত্রায় ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার লোক হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিয়া আদালতে সরকারী আফিস ও থানার সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এই সকল স্থানের সম্মুখে বিরাট জনসভায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল; প্রত্যেক থানা স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল। সভা ও শোভাযাত্রা সর্ব্বদাই শান্তিপূর্ণ ছিল কংগ্রেস সেচ্ছাসেবগণ এগুলি পরিচালনা করিতেন। মহিষাদল থানায় একদল উদ্দিপরা

জাতীয় সেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা পরিচালন করিতেন। মহিষাদল থানার সম্মুখে ২০ হাজার লোকের এক সভায় যখন স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন জনৈক পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কয়েকজন কনেষ্টবল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনিও ৪ জন বক্তাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দেন। কিন্তু জনতা তাহা করিতে দেয় না। মিঃ শেখ লাঠি চালনা করিতে কনেষ্টবলদের আদেশ দেন। কিন্তু কনেষ্টবলরা নড়িল না। তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া কনেষ্টবলসহ সরিয়া পড়িলেন। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সভায় সরকারী হস্তক্ষেপের ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত। শত শত সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছে। কিন্তু অল্প কয়টি সভা ছাড়া আর কোথায়ও সরকারী কর্ম্মচারীদের দেখা যায় নাই।

অনেকবার মহকুমার সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হয়। বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার, স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার, দনীপুরে গুলীবর্ষণ, ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন স্থানে গুলীবর্ষণ, স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে হরতাল পালিত হইয়াছে। বহুবার যথাযোগ্য অনুষ্ঠান সহকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে।

মহকুমার ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করিয়াছে। এবিষয়ে তমলুক হ্যামিলণ্টন হাইস্কুলের ছাত্রেরা অগ্রণী ছিল। অনেক স্কুল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। মহকুমার হাইস্কুল সমূহের অনুমান ৫০০ ছাত্র ও শিক্ষক বিপ্লবে যোগ দেন অনেকগুলি স্কুল সামরিক উদ্দেশ্যে দখল করিয়া দীর্ঘকাল সৈন্যদের দখলে রাখা হয়।

কংগ্রেসী ডাক বিভাগ

সেন্সার ব্যবস্থার অনিষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং সরকারী ডাক ব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া আমরা নিজস্ব ডাক চলাচলের ব্যবস্থা

চালু করিয়াছিলাম। মহকুমার সর্ব্বত্র আমাদের ডাক বিভাগের শাখা ছিল এবং জেলার অন্যান্য মহকুমা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যালয়ের সহিত আমাদের ডাকের যোগাযোগ ছিল।

এই মহকুমায় "বিপ্লবী" নামে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা একটি বুলেটিন রীতিমত বাহির হইত।

সুতাহাটা, মহিষাদল ও নন্দীগ্রাম হইতেও মাঝে মাঝে বুলেটিন বাহির হইত।

সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের শিবির ছিল। সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবক ও শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সরকারী বাহিনী শিবিরগুলি জ্বালাইয়া দেয় এবং যে সকল গ্রামে ঐ সকল শিবির ছিল সেই সকল গ্রামের বাসিন্দাদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু কর্ম্মীরা দমিয়া না গিয়া সেই গ্রামের অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় নূতন শিবির নির্ম্মাণ করে। কতকগুলি শিবির বার বার ধ্বংস করা হয়। কিন্তু সরকারী লোকেরা যতবার ঐগুলি ধ্বংস করে, ততবারই নূতন শিবির নির্ম্মিত হয়। মহকুমার উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাওয়ার পর গৃহহীন গ্রামবাসীরা প্রথমেই শিবিরগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করে।

মহকুমায় অনেকগুলি নিষেধমূলক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। কেবল তমলুক সহরে সান্ধ্য আইন ছাড়া আর সমস্ত আইন সকলে মিলিয়া অমান্য করে।

সমুদয় সরকারী কার্য্যালয় বয়কট করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়। আদালতগুলি বেশীর ভাগ সময়ই খালি থাকিত। সেগুলিতে কাজও হইত সামান্য। রেজিষ্টারী অফিসও বর্জ্জন করা হয়। সরকারী রোষবহ্নি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের উপর পড়ে কারণ, কংগ্রেসী সদস্যগণ ঐ সকল বোর্ড দখল করিয়া কাজে

লাগাইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠান দখল করে। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সরকারী কর্ম্মচারী এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন, এইরূপ লোকদ্বারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসীরা পুনরায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর মহকুমা লোক্যাল বোর্ড সরকারী দখলে চলিয়া যায়।

অনেকগুলি ইউনিয়ন বোর্ডও কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আমাদের সদস্যগণ চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় বন্ধ করেন এবং সার্কেল অফিসারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। চৌকিদার ও দফাদারদের উর্দ্দি একত্র করিয়া পুড়াইয়া ফেলা হয়। যে সকল ইউনিয়ন বোর্ড সহযোগিতা করে নাই, সেগুলি কংগ্রেসী লোকেরা দখল করেন এবং কাগজপত্র পুড়াইয়া ফেলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অভিযোগে তিনটি ইউনিয়ন বোর্ড সরকার দখল করিয়া লন।

ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট অনুরোধ করা হয়।

সরকারী কার্য্যালয়ে যুগপৎ হানা দেওয়ার পরিকল্পনা

জনসাধারণ ধৈর্য্যহীন হইয়া উঠিল, তাহারা সরকারী কার্য্যালয়গুলি দখল করিতে চাহিল। কর্ম্মীদের এক সভায় স্থির হইল, ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থানা আদালত ও অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রে যুগপৎ হানা দেওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট তারিখের ৫ দিন পূর্ব্বে মহকুমা কর্ম্মীদের এক সভায় বিশদভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই সংগ্রামে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু-মুসলমান যোগ দিয়াছিল। বিশেষ কারণে পাঁশকুড়া ও ময়না থানা আক্রমণ করা গেল না।

২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গাছ ফেলিয়া তমলুক-পাঁশকুড়া, তমলুক-মহিষাদল, তমলুকনরঘাট, কুকরাহাটি-বালুঘাটা সড়ক এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রোধ করা হয়। ৩০টি পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ২০ জায়গায় সড়কের উপর বড় গর্ত্ত করিয়া রাখা হয়। ২৭ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা হয় এবং ১২৪টি টেলিগ্রাফ তারের থাম ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কোশি ও হুগলী নদীর খেয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এই সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে গভর্ণমেণ্ট সেই রাত্রেই ব্যাপারটা জানিতে পারেন। সঙ্গীনের ভয় দেখাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা তমলুক-পাঁশকুড়া সড়ক অংশিকভাব অবরোধ-মুক্ত কর' হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ২টায় সড়কটিকে মোটর চলাচলের উপযোগী করা হয়। অন্যান্য রাস্তাগুলি পরিষ্কার করিতে ১০।১২ দিন সময় লাগে। ১৫ দিনের মধ্যে খেয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ একই তারিখে তমলুক মহকুমায় ৩টি থানা যুগপৎ আক্রান্ত হয়। পরদিন নন্দীগ্রাম থানায় হানা দেওয়া হয়। যাহারা হতাহত হয়, তাহাদের শরীরের সম্মুখের দিকে গুলী লাগে। সমস্ত সরকারী কেন্দ্র বিশেষভাবে থানাগুলি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়! ঐদিন এবং তৎপরবর্ত্তী সাত দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত স্থানগুলি পুড়াইয়া ধ্বংস করা হয়; ১টি থানা, ১টি ফাঁড়ি ২টি সাবরেজিষ্টারী অফিস, কাগজপত্রসহ ১৩টি ডাকঘর, ৯টি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, কাগজপত্রসহ ১০টি পঞ্চায়েৎ অফিস, ১২টি মদের দোকান, ৪টি ডাক বাংলো ও মহিষাদল রাজষ্টেটের কাছারী। মহকুমার ৩৫০ জন চৌকিদারের উর্দ্দি সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা হয়। বিপ্লবীরা ১৩ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে (তন্মধ্যে দারোগাও আছে) গ্রেপ্তার করে। তাঁহারা সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহাদিগকে বাড়ী যাওয়ার ভাড়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কাহারও প্রতি দুর্ব্ব্যবহার

করা হয় নাই। বিপ্লবীরা ৬টি বন্দুক ও কয়েকটি তরবারি হস্তগত করে।

গুলীবর্ষণের মুখে অগ্রসর

পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাহ্ণ ৩টার সময় বিভিন্ন দিক হইতে ৪টি বৃহৎ শোভাযাত্রা সহরের দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এবং বহু স্ত্রীলোক ছিল। শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যপূর্ণ সহরটিকে দেখিয়া সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি সড়ক সিপাহীরা লাঠি লইয়া পাহারা দিতেছিল, এবং সিপাহীদের পিছনে ছিল রাইফেলধারী সৈন্য। শোভাযাত্রীরা সর্ব্বদাই শান্ত ও অহিংস ছিল।

পশ্চিম দিক হইতে একটি বড় শোভাযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে প্রায় আট হাজার বিপ্লবী। তাহারা থানার নিকটবর্ত্তী হইলে জনৈক দারোগার পরিচালনাধীনে সিপাহীরা তাহাদের উপর প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালনা করে। কিন্তু ইহাতেও শোভাযাত্রা থামিল না। লাঠির আঘাত উপেক্ষা করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। লাঠিচালনা ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত দারোগা গুলী চালাইবার আদেশ দিলেন, এবং বে-পরোয়া গুলী চলিল। পাঁচজন বিপ্লবী গুলীর আঘাতে লুটাইয়া পড়িল। গুলী-বৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া শোভাযাত্রা ছত্র ভঙ্গ হইয়া গেল। কয়েকজন বিপ্লবী গুলী উপেক্ষা করিয়া থানা অভিমুখে ধাবিত হয়। রাইফেলধারী সৈন্যরা দৌড়াইয়া গিয়া থানায় আশ্রয় লয় এবং সেখান হইতে গুলী চালায়। একজন বীর বিপ্লবী গুলীর আঘাতে তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং আহতের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই। অবশিষ্ট লোকদিগকে সরিয়া যাইতে হয়। আহত লোকদিগকে তাহাদের সঙ্গীরা শুশ্রূষা করে, অনেককে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শুশ্রূষা করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যেরা তাহাদের মধ্যে একজনকে ছিনাইয়া লয়। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বেরাকে সৈন্যেরা পা

ধরিয়া রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। শ্রীযুক্ত বেরার ক্ষতস্থান হইতে অজস্রধারায় রক্ত পড়িতেছিল। অবশেষে থানার সম্মুখে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা হয়। যখন শ্রীযুক্ত বেরার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ক্ষতের বেদনা ভুলিয়া গিয়া আপনার গুলী জর্জ্জর দেহটিকে থানার দরজা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেন। জয়ের আনন্দে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি এখানে,—থানা দখল হইয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

মহিলা সত্যাগ্রহীর আত্মদান

৭৩ বৎসর বয়স্কা মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস সেবিকা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার পরিচালনায় আর একটি শোভাযাত্রা উত্তর দিক হইতে সহরে প্রবেশ করিল; তাহারা শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের পরিচালনাধীনে ব্রিটিশ সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। 'বাণপুকুর'-এর পাশে সঙ্কীর্ণ স্থানে তাঁহারা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা কিছু দূর সরিয়া যান। তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ দাস নামক জনৈক বালক সৈন্যদের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া একজনের বন্দুক কাড়িয়া লয়। ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্যেরা তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। অতঃপর স্বাধীনতার বীর সৈনিকেরা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে আবার সরকারী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। সৈন্যেরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ম্মমভাবে গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। সরকারী সৈন্যেরা প্রথমে তাঁহার দুই হাতে গুলী মারে। তাঁহার হস্তদ্বয় নত হইলেও জাতীয় পতাকা তিনি তখন সমগ্র শক্তিতে ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতীয় সৈন্যদের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহার উত্তরে আসিল একটি

বন্দুকের গুলী যাহা তাঁহার কপাল ভেদ করিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। পরাধীন ভারতের এই মহীয়সী নারীর রক্তে তাম্রলিপ্তের ধূলি পবিত্র হইল। দেহ নিষ্প্রাণ, কিন্তু তখনও তাঁহার হস্তের জাতীয় পতাকা সগৌরবে পৎপৎ করিয়া উড়িতেছে। একজন সরকারী সৈন্য দৌড়াইয়া গিয়া বীর বিক্রমে লাথি মারিয়া জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলিয়া দিল। ইহার অনতিদূরে লক্ষীনারায়ন দাস (১৩), পুরীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বহু লোক আহত অবস্থায় সজ্ঞাহীন। কয়েকজন আহত লোককে তাহাদের সঙ্গীরা সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া গেল। এখানেও সৈন্যরা আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসায় বাধা দান করে। একজন আহত বিপ্লবীর 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকারের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি স্ত্রীলোক নিকটবর্ত্তী পুকুরে শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া তাহার জন্য জল আনিতে যায়। কিন্তু একটি পশুস্বভাব সৈন্য তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া জল দিতে মানা করে। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে খুন করতে পার কিন্তু আমি তোমার হুমকির কাছে নতি স্বীকার করিব না।" সৈন্যটি ইহার পর তাহাকে গুলী করিতে সাহস করে না। এই সময় আর একটি শোভাযাত্রা দক্ষিণ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভাযাত্রা শঙ্কর আরা পুলে পৌছাইবামাত্র সরকারী সৈন্যেরা গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে নিরঞ্জন জনা (১৭) তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পূর্ণচন্দ্র মাইতি (২২) আহত হইয়া দুইদিন পরে হাঁসপাতালে মারা যায়। বহু সংখ্যক বিপ্লবী গুলির আঘাতে আহত হয়। শোভাযাত্রায় যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা আহত ব্যক্তিদিগকে যখন শুশ্রুষা করিতেছিল তখন কয়েকজন সৈন্য এই সকল শুশ্রূষাকারিণীকে তাড়া করে। এই সব বিপ্লবী নারীগণ একটি বাটি ও এক বালতি জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহারা চীৎকার

করিয়া সৈন্তদের উদ্দেশ করিয়া বলে, "যদি আহত ব্যাক্তদের শুশ্রূষায় বাধা দেও তবে এই বঁটি দিয়া তোমাদের কাটিয়া ফেলিব।" ইহার পর ইহারা তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে নাই। গুরুতরভাবে আহত কয়েকজন লোককে শোভাযাত্রাকারীরাই সহরের হাঁসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং অনেককে বাড়ীতে পৌছাইয়া দেয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে তিন হাজার লোকের আর একটি শোভা-যাত্রা কাঠের পুল দিয়া সহরে প্রবেশ করে। স্থানীয় বিপ্লবী সৈন্তদের অধি-নায়ক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব ঘোষ শোভাযাত্রীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, যাঁহারা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্ত গুলীর সম্মুখীন হইতে পারিবেন, একমাত্র তাহারাই যেন অগ্রসর হন।" যে সকল কংগ্রেসী বিপ্লবী শোভাযাত্রা চালনা করিতে-ছিল, তাহারা তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সমস্ত শোভা-যাত্রীদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশিষ্ট শোভা-যাত্রীদের উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি চালনা আরম্ভ হয়। ধৃত ব্যক্তিগণও লাঠি চালনার হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। অবশেষে সাত জনকে রাখিয়া অন্তান্ত লোকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের আটক রাখা হয়, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও ছিল। পরে তাহাদের প্রত্যেককে দুই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পশ্চিম হইতে প্রায় একহাজার লোকের আর একটি শোভাযাত্রা পুনরায় থানার দিকে অগ্রসর হইলে প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালনা করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রায় ২০ হাজার নিরস্ত্র ও অহিংস লোক বীরের মত সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। অবিরাম গুলী বর্ষণের মুখে তাহাদিগকে যখন পিছনে হটিতে হইয়াছে, তখনও তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত পুনরাক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা

করিয়াছে। কিন্তু সরকারী বাহিনী অবিরাম সহরে আসিতে থাকে এবং সহরটি সুরক্ষিত করিয়া রাখে। ফলে জনতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে হয়। নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গিয়া মৃতদেহগুলি দাবী করে। কিন্তু তাহাদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

গুলীবর্ষণের দিন এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিন সহরে এবং সমগ্র মহকুমায় হরতাল পালিত হয়। ঘটনার পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তরকারী, মাছ, দুধ প্রভৃতি বিক্রেতারা সহরে তাহাদের জিনিষ বিক্রয় করে নাই। সরকারী সৈন্যরা তমলুক পাঁশকুড়া সড়ক দিয়া নিজেদের লরী চালায় এবং ছাগল, মুরগী, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য যেখানে যাহা পাইয়াছে, তাহাই হস্তগত করিয়াছে।

মহিষাদলে

১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন ইউনিয়ন শোভাযাত্রা সংগঠন করে। প্রায় পাঁচ হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা পূর্ব্বদিক হইতে থানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মহিষাদল থানার জনৈক কর্ম্মচারী পরিচিত একজন পিয়নকে দিয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করেন। লোকটি স্থানীয় জমিদারের দেহরক্ষী। সে বেপরোয়া গুলী চালাইয়া দুই জনকে নিহত করে এবং ১৮ জনকে জখম করে। শোভাযাত্রীরা সাময়িক-ভাবে হটিয়া যায়।

"বিদ্যুৎ বাহিনীর" পরিচালনায় সুন্দরাস্থিত থানা কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। পশ্চিমদিক হইতে আর একটি শোভাযাত্রা আসিয়া উহার সহিত যোগ দেয়। শোভাযাত্রায় মিলিত প্রায় ২৫ হাজার লোক তখন পুনরায় থানার দিকে অগ্রসর হয়। কুখ্যাত ঐ কর্ম্মচারী সশস্ত্র কনেষ্টবল বাহিনী ও থানার অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা

বেপরোয়াভাবে গুলীবর্ষণ আরম্ভ করে। জনতা অল্প হটিয়া গিয়া আবার অগ্রসর হয়। আবার প্রচণ্ড গুলীবৃষ্টি! এইভাবে পর পর চারিবার থানা আক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় অফিসার বা দারোগার বাসভবন পুড়াইয়া ফেলা হয়। থানার কার্যালয় বিখ্যাত হিজলী খালের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। থানার লোকেরা চতুর্দ্দিক হইতে গুলী চালনা আরম্ভ করে এবং দুই জন নিহত হয়।

খালের পশ্চিম তীরে প্রায় ১৫০ গজ দূরে মাছের বাজারের নিকটে একজনকে নিহত অবস্থায় দেখা যায়। উক্ত দিবসে ১০ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। অনেক দর্শকও নিহত হইয়াছে। এই নরমেধ যজ্ঞে ঐ কুখ্যাত কর্ম্মচারীটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং বন্দুকের গুলী ফুরাইয়া গেলে সে দৌড়াইয়া গিয়া স্থানীয় জমিদার বাড়ী হইতে নূতন কার্ত্তুজ লইয়া আসে।

চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল গুলী বর্ষণের মুখে নারী শোভাযাত্রীদিগকে অকুতোভয়ে ও ধীরভাবে আহতের সেবা করিতে দেখা গিয়াছে। রেডক্রশ ব্যাজধারীরা ষ্ট্রেচারে করিয়া আহত লোকদিগকে কংগ্রেস হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী সৈন্যরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও গুলীবর্ষণ বন্ধ করে নাই। তাহারা ষ্ট্রেচার বাহক কিম্বা শুশ্রূষাকারিণী কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। সকলের প্রতিই নির্ব্বিচারে গুলী চালাইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৩ জনের আঘাত গুরুতর। বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র সামন্ত ও ক্ষুদিরাম বেরা পরে গ্রেপ্তার হন। ধৃত অবস্থায় ক্ষুদিরামের পরে মৃত্যু হয়। দীর্ঘকালপরে অপর ৫০ জন সহ সুভাষের বিচার হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারে বিব্রত হওয়ার পর সেসনজজের বিচারে তাঁহারা মুক্তি পান।

সূতাহাটায় বিপ্লবের জয়

পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টম্বর পূর্ব্ব ও পশ্চিম

দিক হইতে প্রায় ৪০ হাজার লোকের একটি বিরাট শোভাযাত্রা থানার দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে উর্দ্দিপরা "বিদ্যুৎ বাহিনী"র সদস্য এবং "ভগিনী সেনা শিবিরের" সদস্যরা ছিলেন। জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশ গুলী চালাইবার সুযোগ পাওয়ার পূর্ব্বেই থানায় ঢুকিয়া সকলকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করে। কিছু কার্ত্তুজসহ ৬টি রাইফেল এবং কয়েকটি তরবারি তাহাদের হস্তগত হয়। বিপ্লবীরা থানার পাকা ইমারতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং থানার ভিতরে যাহা কিছু ছিল সব আগুনে ফেলিয়া দেয়। এই সময় দুইটি বিমান জনতার উপরে খুব নীচুতে নামিয়া আসে এবং একটি বোমা ফেলে। বোমাটি নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে পড়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। [দায়রা আদালতে পুলিশের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, বিমান হইতে তরল অগ্নির মত কোন জিনিষ নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।]

অতঃপর বিজয়ী বিপ্লবীরা থানার এলাকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং খাসমহল অফিস, সাবরেজিষ্ট্রারের অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ইত্যাদি পুড়াইয়া দেয়।

সরকার পক্ষের যে সকল লোককে বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার করে তাহাদের প্রতি তাহার সদয় ব্যবহার করে এবং তাহাদিগকে বাড়ী যাইবার জন্য ভাড়া দিয়া দেয়।

১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রায় ১০ হাজার বিপ্লবী নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করে। একটি সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে একদল সশস্ত্র কনষ্টেবল তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে চার জন নিহত হয় এবং একজন পরে তমলুক সরকারী হাসপাতালে মারা যায়। ১৬ জন আহত হয়। এই সময় বিপ্লবীদিগকে হটিয়া যাইতে দেখা যায়। তাঁহারা আফিম ও গাঁজার

দোকান, ঋণ সালিশী বোর্ডের অফিস, রিয়াপাড়াস্থিত মহিষাদল রাজষ্টেটের কাছারী এবং সেখানকার ডাকঘর পুড়াইয়া দেয়।

বিপ্লবীগণকে শায়েস্তা করিবার জন্য বাহির হইতে শত শত শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য আমদানী করা হয় এবং গ্রামের সন্নিকটে সৈন্যদের অনেকগুলি ছাউনী পড়ে। এই সকল ছাউনী হইতে ব্রিটিশ সৈন্যরা গ্রামে গিয়া হানা দেয় এবং বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিতে আরম্ভ করে এবং স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু নির্ব্বিশেষে সকলের উপর এমন ভাবে অত্যাচার করে যে উহা বহু প্রচারিত নাৎসী অত্যাচারকেও হার মানায়। তবে সরকারী সৈন্যরাও গ্রামবাসীদের পুনরাক্রমণের ভয়ে এতদূর বিচলিত হইয়াছিল যে, বড় দল না হইলে ছাউনীর বাহির হইত না এবং গ্রামে হানা দিয়া দিনের আলোকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

এই সময় কংগ্রেসকর্ম্মীরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন। মেদিনীপুর যখন ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়, তখন তাঁহাদের বিরাট সমস্যায় সম্মুখীন হইতে হয়।

ঝড়ের তাণ্ডব

১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রচণ্ড ঝড়ে সমগ্র মহকুমাকে অবর্ণনীয় দুর্গতির কবলে নিক্ষিপ্ত করে। এই ঝড়ে স্থানীয় লোকের অনুমান অনুসারে প্রায় ১০ হাজার লোক ও শতকরা ৭৫ভাগ গবাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে। তমলুকের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমান অনুযায়ী প্রায় ৩৮৩৭ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১০৭২ আহত হইয়াছে, ৬৮১৯৩ গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে, ১১০৩৪৬ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং ৭৬৯৫৮ গৃহের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে, দুইটি ষ্টিমার কয়েকটি লঞ্চ ও বহু নৌকা ডুবিয়াছে। জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের প্রায় সবগুলি সড়কই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কয়েকটি রাস্তার অবস্থা এমন হয় যে, উহা মেরামত

করাও অসম্ভব হয়। ১১০ মাইল নদীর বাঁধ স্রোতের বেগে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ২১৫১১৪৯ একর জমির অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হইয়াছে। (১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের ঝড় ও জলোচ্ছাসের রিপোর্ট—১ম ভাগ মেমো নং ৬৩৬৩-আর দ্রষ্টব্য।)

সরকারী নির্ম্মমতা

তমলুকের মহকুমা হাকিম কলিকাতা হইতে ঘূর্ণিবাত্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত তিনখানি টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎসম্বন্ধে জনসাধারণকে সাবধান করা এবং এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্ম কোনরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। অধিবাসীবৃন্দের তরফ হইতে সেই দুর্য্যোগ-ঘন রাত্রের জন্ম সাময়িকভাবে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী করা হইলে তিনি তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। গাছের মাথায় ও ঘরের চালায় আশ্রয় লইয়া যাহারা জলোচ্ছাসের হাত হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ম নিষিদ্ধ এলাকায় নৌকা চলাচল পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয় নাই যথাযথ সাহায্যের অভাবে যখন শত শত গ্রামবাসী মরিতেছিল তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া কোনরূপ সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা তো করা হয়ই নাই, এমন কি বে-সরকারী সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্য্যন্ত এক মাস যাবৎ কোনরূপ কাজ করিবার—অনুমতিও দেওয়া হয় নাই।

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির জনৈক কর্ম্মী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণের জন্য আসিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুর্গতদের সাহায্যদানের জন্য তিনি চাউল এবং অন্যান্স যে সব প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, মেদিনীপুরের বিদ্রোহিগণ যে সমস্ত রাজনৈতিক

দুষ্কর্মকে প্রশ্রয় দিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের এই দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। সরকারী নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য : "জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার সহিত তাল রাখিয়া কোন কিছুই করেন নাই এবং তথাকথিত "বিদ্রোহী" জনসাধারণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বপোষিত বিদ্বেষের ফলেই দুর্গতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের যে কর্ত্তব্য পদাধিকার বলে তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই কর্ত্তব্য তিনি সম্পন্ন করেন নাই। রাজনৈতিক দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ রাখিয়া এই সব বন্যাধ্বিস্ত জনসাধারণকে কোনরূপ সরকারী সাহায্য তো দেওয়া উচিতই নয় এমন কি, বে-সরকারী সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলিয়া তাঁহার রিপোর্টে তিনি যে মন্তব্য করেন, তাহাতেই তাঁহার মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে" বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীতে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি সংবাদপত্র সমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া মেদিনীপুর সম্পর্কিত দুর্ঘটনার সমস্ত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যার সতেরো দিন পর প্রকৃত ঘটনা বিকৃত ও গোপন করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রিরূপে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তদন্ত করিতে আসিলে যাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং স্থানীয় বিপর্য্যয়ের প্রকৃত ঘটনা জানান, তাঁহাদের স্পেশাল কনেষ্টবল করিয়া থানায় নিয়মিত হাজির থাকিতে বাধ্য করা হয়।

এই নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের পরেও কতকগুলি গৃহ লুট ও দাহ করা হয়। ডাঃ মুখোপাধ্যায় যখন তদন্তের জন্য তমলুক যান তখন তিনি এই সমস্ত ভস্মীভূত গৃহ দেখিতে পান।

কংগ্রেস কর্ম্মিগণ অবিলম্বে বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দুর্গতদের সাহায্যার্থে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃতদেহের সৎকার, আহতদের সেবা রাস্তা ও জলাশয় পরিষ্কার এবং খাদ্য ও ঔষধ বিতরণের কার্য্যে ব্রতী হন। মৃত গবাদি পশুর কতক নদীর জলে নিক্ষেপ করা এবং কতক মাটিতে পুতিয়া ফেলা হয় এবং জনসাধারণকে পানীয় জল ফুটাইয়া খাইতে বলা হয়। ষাট মাইল ব্যাপী বাঁধ মেরামত করা হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের উদ্বৃত্ত ধান ও চাউলে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং বাহির হইতে ও ধান চাউল আনাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ এবং করা হয়।

বহুদিন পরে দেশব্যাপী জনমতের চাপে পড়িয়া কয়েকটি সরকারী সাহায্যকেন্দ্র গঠিত হয়। সহানুভূতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত এই সব সাহায্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কোন উপকারেই আসে নাই।

এই সব সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট লক্ষণীয় হইয়াছিল যে, যে সমস্ত বদ্‌মাইস প্রকৃতির লোক সরকারের বর্ব্বর নির্য্যাতন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের মুক্ত-হস্তে সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা

গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ও সাহসের সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূলগত উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর ভারতীয় ফেডারেশন যখন গঠিত হইবে তখন উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তদানীন্তন কালের অবস্থা বিপর্য্যয়ের দরুণ নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে না পারিলেও কংগ্রেস কমিটির দ্বারা একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধে কার্য্য করিবার ক্ষমতা এই সর্ব্বাধিনায়কের ছিল। সাধারণ কার্য্যক্রম কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত এবং সর্ব্বাধিনায়ক তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। মহকুমা কংগ্রেস কমিটির অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা সর্ব্বাধিনায়কের ছিল। সর্ব্বাধিনায়ক নিজে ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের—যথা আইন ও শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন ব্যবস্থা, কৃষি ও প্রচারের—ভার এক একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৪৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুকের প্রতিটি থানায় একটি করিয়া থানা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ বাহিনী

মহিষাদলে প্রথম বিদ্যুৎ বাহিনী গঠিত হয় এবং পরে তমলুক ও নন্দীগ্রামের প্রত্যেক থানা তাহাদের নিজ নিজ বিদ্যুৎ বাহিনী গঠন করে। প্রত্যেক বাহিনীতে একজন করিয়া জি ও সি এবং একজন কম্যাণ্ডাণ্ট ছিল এবং ইহার তিনটি বিভাগ ছিল ঃ—[১] সমর শাখা, [২] গোয়েন্দা বিভাগ এবং [৩] এ্যাম্বুলেন্স। ইহার অধীনে সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স প্রভৃতি ছিলেন। সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা "১৯৪২-৪৩ সালের ভারতবর্ষের হাঙ্গামা সম্পর্কে কতিপয় প্রকৃত তথ্যে" এই বিদ্যুৎ বাহিনী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনুধাবন যোগ্য।

"বাঙ্গলা দেশে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপে যথেষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা ও সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। কার্য্যকরী সাবধানতা পদ্ধতি

এবং প্রাথমিক কৌশলী নীতি—যথা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুযায়ী ঘেরাও করা ও পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ জাতীয় আন্দোলনে অনুসৃত হইত। এই সব বিশৃঙ্খলাকারী বিদ্রোহীদের সহিত আহতদের শুশ্রূষার্থে ডাক্তার এবং নার্স থাকিত এবং ইহাদের গোয়েন্দা বিভাগও অত্যন্ত দক্ষ ছিল।"

এই বিদ্যুৎবাহিনী জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক জাতীয়বাহিনী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি খোলা হয়ঃ [১] গেরিলা বিভাগ, [২] ভগ্নী বাহিনী এবং আইন ও শৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্তি প্রাপ্ত কুখ্যাত ডাকাত ও চোরদের গ্রেপ্তার এই আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই সব ডাকাত ও চোরদের গ্রেপ্তার করিয়া জাতীয় সরকারের আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে আইন অনুযায়ী তাহাদের শাস্তিবিধান করা হইত।

মহকুমার প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতীয় সরকার এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহা স্বেচ্ছায় ভাঙ্গিয়া দিবার পরও উহার জনপ্রিয়তার এতটুকুও হানি হয় নাই। পরবর্ত্তী সর্ব্বাধিনায়কদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সাহু এবং বরদাকান্ত কুইতি প্রভৃতি প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৪ সালের ২৯শে জুলাই এবং ৬ই আগষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত মহাত্মাজীর বিবৃতি মহকুমা কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক নূতন আলোকের সন্ধান দেয়। চতুর্থ সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত কুইতি ১৯৪৪ সালের ৮ই আগষ্ট এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন যে, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। পরদিন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ধাড়া এক বিবৃতি

প্রচার করিয়া ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে জাতীয় সরকারের কার্য্যকলাপের বিবৃতি ঘোষণা করেন এবং এই সঙ্গে বিদ্যুৎ বাহিনী ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯৪৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মহাত্মাজীর আদেশ অনুযায়ী দেড়শত কর্ম্মী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে থানা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিও এই সময় ভাঙ্গিয়া যায়। জাতীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বিচার বিভাগই জাতীয় সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিভাগ। প্রত্যেক থানা জাতীয় সরকারের অধীনে একটি করিয়া বিচার বিভাগ ছিল। এই আদালতে মামলা দায়ের করিতে হইতে হইলে এক টাকা ফী দিতে হইত। এই ফী পরে বাড়াইয়া দুই টাকা করা হয় এবং ইহারও পরে জরুরী মামলার জন্য ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আরও দুই টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সব আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়-বিধ মামলাই বিচার পূর্ব্বক মীমাংসিত হইত। থানা জাতীয় সরকার আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল মহকুমা জাতীয় সরকার আদালতে করিতে হইত এবং মহকুমা জাতীয় সরকার আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে তিনজন বিচারক লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যালে করিতে হইত। এই সমস্ত ভ্রাম্যমান আদালত জনসাধারণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে বসিত। আদালতের বিচারকালে জনসাধারণ সেখানে উপস্থিত থাকিত এবং কখনও কখনও দুই তিন শত দর্শক আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিত। মহকুমা ও জেলা আদালতের এবং হাইকোর্টের বহু মামলা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত আদালত কর্ত্তৃক চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় কখনও কখনও উকীল ও মোক্তারগণ এই আদালতে উপস্থিত থাকিতেন এবং আদালতের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন

করেন। ফৌজদারী মামলার আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধ অনুযায়ী তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইত। জরিমানা, আদালতের কার্য্যকাল পর্য্যন্ত আটক রাখা, সাবধান করিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে পলাতক আসামীদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সাধারণে নীলাম করা হইত এবং ডিক্রীজারীর ফলেও কখন কখনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নীলাম করা খুব প্রচলিত ছিল না। জাতীয় সরকার এতদূর মর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় আদালতের সাহায্যেই মামলা মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইত এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইত। সুতাহাটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত আদালতে ৮৩৬টি মামলা, নন্দীগ্রামে ২২২টি মামলা, মহিষাদলে ১০৫৫টি মামলা এবং তমলুকে ৭৯৪টি মামলা অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ২৯০৭টি মামলা জাতীয় সরকারের বিভিন্ন সরকারের আদালতে দায়ের করা হয় এবং তন্মধ্যে ১৬৮১টি মামলার বিচার করা হয়।

এই সমস্ত মামলার মাত্র কয়েকটি মহকুমা আদালতে এবং স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যালে পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। জাতীয় সরকার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে মুলতুবী মামলার ফী হিসাবে প্রদত্ত অর্থ ফরিয়াদীদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। জাতীয় সরকার জনসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল যে বহু লোক এই ফী ফেরত লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং জাতীয় সরকার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের মামলার বিচারের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

যুদ্ধ বিভাগ

সরকারী নির্য্যাতন ব্যবস্থার প্রতিরোধ-কার্য্যের জন্যই এই বিভাগের

পত্তন হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সরকারী অবস্থার ফলে পীড়িত ও চরম দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত জনসাধারণের সাহায্যের জন্যই এই বিভাগের অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইত।

এই দুইটি বিভাগ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। বিভিন্ন স্থান হইতে কাপড়, ধান-চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হইত। মজুতদার ও মুনাফাখোরদের উপর নোটিশ জারী করিয়া জাতীয় সরকার ইহাদের শোষণ বন্ধ করেন এবং তাহাদের অর্থ এবং ধান-চাউল দিয়া দুঃস্থদের সাহায্য করিতে বাধ্য করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে জাতীয় সরকারের যুদ্ধ বাহিনী শিবিরের সদস্যগণ একবেলা ভাত একবেলা ছোলা সিদ্ধ খাইতেন এবং ইহার পর একাদিক্রমে নয় মাস যাবৎ ইহারা একবেলা তিন ছটাক চাউলের ভাত একবেলা আধপোয়া সিদ্ধ অথবা ভাজা ছোলা খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। বহুপ্রকার ঔষধ পীড়িতদের মধ্যে বিতরিত হয়। ইঁহারা সর্ব্বসমেত ৭৯,০০০ হাজার টাকা মূল্যের কাপড়চোপড়, ঔষধ ও ধান-চাউল দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করেন।

আইন ও শৃঙ্খলা

এই বিভাগ গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে মহকুমার আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। এই বিভাগের কর্ম্মতৎপরতার ফলেই কতিপয় কুখ্যাত চোর ও ডাকাত গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের শাস্তি বিধানও করা হয়। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কুখ্যাত ও ভীষণ প্রকৃতির ডাকাতদের লুঠতরাজ প্রভৃতি অরাজকতা ও আতঙ্ক স্থষ্টির জন্য জেল হইতে মুক্তি দেয় এবং তাহাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট প্ররোচিতও করে এবং বহুক্ষেত্রে সরকারী থানা কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এই সব অপরাধ নিবারণের জন্য জাতীয় সরকার সুদৃঢ় ব্যবস্থা

অবলম্বন করিলে ইহার অবসান ঘটে। জাতীয় সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা যেমন দ্রুত, কার্য্যকরী এবং সুলভ ছিল, তেমনিই ছিল সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে একান্তভাবে গ্রহণীয়।

স্কুলের নিয়মিত সাহায্য দানের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয় এবং স্কুলসমূহ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ইনস্পেক্টারগণ পরিদর্শন করিতেন। ইহা ছাড়া পৃথক পৃথক মন্ত্রীর অধীনে প্রচার ও অর্থ বিভাগও ছিল।

নারীর প্রতি অত্যাচার

পুলিশ মহিষাদলের ছয়টি বিভিন্ন স্থানে নয় বার, তমলুক এবং নন্দীগ্রামে চারবার এবং সুতাহাটায় দুইবার গুলী চালনা করে এবং সর্ব্বসমেত ৪৪ জন এই গুলী চালনার ফলে নিহত হয়। আহতদের সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

নিহতদের মধ্যে একজন ৭৩ বৎসর বয়স্কা শ্রমিক রমণী এবং ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ষোলটি কিশোর বালক ছিল। শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান-কারীদের উপর যে কতবার লাঠি চালনা করা হইয়াছিল তাহার সঠিক কোন হিসাব নাই। কিন্তু এই লাঠিচালনা ও নির্য্যাতনেও জনসাধারণের স্বাধীনতাকামী আত্মা এতটুকু সঙ্কুচিত অথবা কম্পিত হয় নাই।

লাঠি ও গুলী চালনার পর পুলিশ যে সকল আহতদের গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইত, তাহাদের যথাযোগ্য সেবা ও শুশ্রূষার ও কোন ব্যবস্থা করা হইত না এবং ইহার ফলেও বহু আহত ব্যক্তির সরকারী হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্ত কতিপয় কর্ম্মচারী এই মহকুমার চুয়াত্তরটি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। এই সব ধর্ষিতা নারীদের মধ্যে

একজন ছিলেন গর্ভবতী এবং এই অত্যাচারের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা ছাড়া ধর্ষণ করিবার আরও অসংখ্য চেষ্টা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অধিকাংশ সময়েই নারীগণ দল বাঁধিয়া এই সব নরপশুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। এই উপায়ে কিছু ফল দর্শায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের আত্মরক্ষার্থে ছোরা দেওয়া হইত এবং সেই অস্ত্রের শাণিত দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতায় ভীত হইয়া এই নর পশুরা পলায়ন করিত। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ছয় শত সৈন্য মহিষাদল থানার মাশুরিয়া, দিলি মাশুরিয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম ঘেরাও করিয়া গৃহস্থদের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি লুঠ তরাজ করিয়াই শুধু তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই—তাহারা একদিনে ৪৬টি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

মিঃ বি আর সেন, সম্ভবতঃ ইহার তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে তদন্তের কোন ফলাফলই অদ্যাবধি জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে কতিপয় নিপীড়িত হতভাগ্যের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ নারীর উপর স্বল্পাধিক অত্যাচারের সংখ্যার সঠিক কোন হিসাব নাই। অত্যাচারী পশুরা অনেক সময় নারীদের দেহ হইতে গহনা ছিনাইয়া লইয়াছে। কতিপয় ক্ষেত্রে মেয়েদের কানের মাকড়ি জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়ার ফলে মেয়েদের কানের ডগা ছিঁড়িয়া যায়। কতিপয় ক্ষেত্রে যুবতী ও বৃদ্ধা নারীদের উপর বেত্রচালনাও করা হয়।

শিশুদের উপর অত্যাচার

শিশুদেরও সমানভাবে নির্য্যাতনের অংশ গ্রহন করিতে হয়। বস্তুতঃ যখন সৈন্যেরা গৃহগুলিতে হানা দিয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই তখন তাহারা যে সকল ছোট ছোট শিশুকে ধরিতে সক্ষম হয়, তাহাদেরই উপর নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে থাকে।

স্থানীয় অধিবাসীগণ নানা প্রকারে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হন। এই সমস্ত গ্রামবাসীকে অনাহারে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে বাধ্য করা হয়। মরণোন্মুখ অবস্থায় তাহাদের ভাগ্যে মুক্তি জুটিয়াছে। দুরন্ত শীতের রাত্রে অধিবাসীদের পুষ্করিণীর শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের উলঙ্গ করিয়া রাখা হয়।

অনেক ব্যক্তিকে এমন ভাবে প্রহার করা হয় যে, যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রহার বন্ধ করা হয় নাই। সুতাহাটা থানার অন্তর্গত হাতিবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী মন্মথ নস্করকে এমন ভাবে প্রহার করা হয় যে, তাহার প্রস্রাবনালী দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে।

জনৈক ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার নির্য্যাতনের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিবার পরিবর্ত্তে তিনি নির্য্যাতিতের গুহ্যদেশে একখণ্ড রুল ঢুকাইয়া দিতেন এবং তাহা ঘুরাইতে থাকিতেন। উহার ফলে নির্য্যাতিত ব্যক্তি অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করিতে থাকিত।

এই মহকুমায় মোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হয়। উহার মধ্যে সুতাহাটা থানার ১১টি ইউনিয়নের উপর ৫০ হাজার টাকা; ৫নং, ৮নং ও ১৪নং ইউনিয়ন বাদে নন্দীগ্রাম থানার উপর ৫০ হাজার টাকা; ১নং, ২নং ও ৩নং ইউনিয়ন বাদে মহিষাদল থানার উপর ৫০ হাজার টাকা; ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং, ১১নং ও ২৩নং ইউনিয়ন বাদে তমলুক থানার উপর ২৫ হাজার টাকা এবং পাঁশকুড়া থানার ১৬নং, ১৭নং ও ১৮নং এই তিনটি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাচার করিয়া উহাদের ধর্ম্মমতে আঘাত দেওয়া

হয় এবং উহাদিগকেই বিশেষভাবে নির্য্যাতন করা হয়। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ ছিঁড়িয়া ফেলা হয় এবং সময় সময় উহা পদতলেও পিষ্ট করা হয়। অলঙ্কারসহ হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি অপহরণ ও মন্দির অপবিত্র করা হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের কার্য্য

তমলুক মহকুমায় তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে গোয়েন্দা-বিভাগের লোকজনেরা সর্ব্বাধিক কর্ম্মতৎপর ছিল। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মব্যস্ততায় সাধারণের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ ও সৈন্যদের চূড়ান্ত অত্যাচারের সাহায্যকারীরূপে গোয়েন্দাগণ স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হইতে সংবাদাদি আদায় করিবার জন্য তাহাদের পীড়ন ও নির্য্যাতনের সমস্ত কলা-কৌশলগুলিই প্রয়োগ করিয়াছে।

তমলুক, মহিষাদল ও সুতাহাটা থানায় ২৮টি স্থানে গোয়েন্দা শিবির স্থাপন করা হয়।

মহিষাদল থানা

(১) ব্যাধত্যাহাট, (২) লক্ষ্যা, (৩) কাটাটিগ্রী, (৪) বৈকুয়াহাট, (৫) গোপালগঞ্জ হাট, (৬) খঞ্চে, (৭) হরিখালি, (৮) মহিষাদল ও (৯) গেঁওখালি।

তমলুক থানা

(১) তমলুক (২) ঘোড়া ঠাকুরা, (৩) ডিমারী হাট, (৪) বল্লুক, (৫) শান্তিপুর, (৬) রাধামণি, (৭) শ্রীরামপুর ও (৮) সিমলা।

সুতাহাটা থানা

(১) সুতাহাটা, (২) বাসুদেবপুর, (৩) বার বাসুদেবপুর, (৪) চকদ্বীপা,

(৫) বালুঘাটা, (৬) ঝিকরুঁখালি, (৭) ফুলবাড়ী, (৮) কালিহাট, (৯) কুকুরহাটি (১০) চৈতন্যপুর (১১) বোসানকচ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত

এই মহকুমার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হয়ঃ—

[১] তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, [২] তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটি, [৩] বাসুদেবপুর কংগ্রেস কার্য্যালয়, [৪] ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব, [৫] বিদ্যুৎ বাহিনী, [৬] সুতাহাটা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, [৭] মহিষাদল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী, [৮] খোদামবাড়ী থানা কংগ্রেস শিবির, [৯] তেরোপেখিয়া বাজার কংগ্রেস শিবির, [১০] ভেকুটিয়া বাজার কংগ্রেস শিবির, [১১] চণ্ডীপুর কংগ্রেস শিবির, [১২] কেশ পাঠ কংগ্রেস কার্য্যালয়, [১৩] কোলাঘাট কংগ্রেস কার্য্যালয়, [১৪] ময়না থানা কংগ্রেস কমিটি, [১৫] শ্রীরামপুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, [১৬] গরম দল [১৭] তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।

১৯৪২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখের এক বিজ্ঞপ্তিতে গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটি এবং উহার সমস্ত শাখা অথবা কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে।

১৯৪২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের বৈপ্লবিক আক্রমণের পরে এই মহকুমার সমস্ত বন্দুক গভর্ণমেণ্ট লইয়া যায়। যাহারা রাজভক্ত কেবলমাত্র তাহাদের বন্দুকগুলি ফিরিয়া পায় এবং অন্যান্য সকলের বন্দুক সরকার আর ফিরাইয়া দেয় না।

গভর্ণমেণ্ট এযাবৎকাল তাঁহার অনুচরদের দুষ্কার্য্য সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের

জন্য ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক উত্তরে বলেন যে, মেদিনীপুরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার অধীনে সৈন্য ও পুলিশবাহিনী ছিল এবং উহার গুপ্তচর বিভাগও ছিল। ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কারাগার ছিল এবং ঐস্থানে লোকজনকে আটক রাখা হইত। মিঃ হক আরও বলিয়াছিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া ফেলিয়াছিল।

যদিও প্রধানমন্ত্রীর উত্তরে মেদিনীপুরের অধিবাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তথাপি উহাদ্বারা মূল বিষয়কে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে মাত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামে তমলুক তাহার সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইল তাহার সবগুলিই সত্য এবং যে সকল বিবৃতি ও ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সবগুলির পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি। জনসাধারণ সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অপরাধিগণের যথাযোগ্য দণ্ড দাবী করে।

নারীধর্ষণের কাহিনী

মহাত্মা গান্ধীর সহিত চণ্ডীপুর, মাওড়িয়া ও লক্ষ্যার ধর্ষিত নারীগণ গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ অপরাহ্নে সাক্ষাৎকার করে। ঐ তিনটি গ্রামের নারীদের উপর মহিষাদল থানার দারোগা নলিনীকান্ত রাহার (বর্ত্তমানে গেঁওখালি থানায় নিযুক্ত) প্ররোচনায় সৈন্যদল যে বীভৎস পাশবিক অত্যাচার করে তাহার নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহাত্মাজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। ১৪ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স্কা নারীদের উপর সৈন্যেরা অত্যাচার করে, গর্ভিনীরাও অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। ৭৩ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় এবং

ধর্ষণের ফলে একজন মৃত্যুমুখে—পতিত হন। মহাত্মাজী ধর্ষিতা নারীদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুজিয়া পান নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঐ ধর্ষিতা নারীদের মেদিনীপুরের উদার হৃদয় বীর সন্তানগণ সমাজে ও গৃহে তাহাদের যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন এবং একটি নারীও পরিত্যক্তা হয় নাই।

ধর্ষিতা নারীদের মর্ম্মন্তুদ বিবৃতি

[ক] মহিষাদল থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীঅধরচন্দ্র মাইতির স্ত্রী শ্রীমতী সিন্ধুবালা মাইতি নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমার বয়স ১৯ বৎসর এবং আমার একটি সন্তান আছে। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় "জনৈক পুলিশ অফিসার" একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। উহারা আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায় এবং বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি.....এই দ্বিতীয়বার আমি ধর্ষিতা হইলাম।"

(এই স্ত্রীলোকটি ১৯৪২ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে একবার ধর্ষিতা হন। দ্বিতীয়বার ধর্ষিতা হওয়ার পরে সাংঘাতিক স্ত্রী-রোগে ভুগিয়া তিনি মারা যান।

গর্ভবতী নারীর উপর বলাৎকার

(খ) মহিষাদল থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর গ্রামনিবাসী শ্রীহরিপদ পণ্ডিতের স্ত্রী শ্রীমতী খুদিবালা পণ্ডিত নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমার বয়স ২১ বৎসর এবং তিনটি সন্তানের জননী। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী প্রাতে অনুমান নয়টার সময় "জনৈক ব্যক্তি" কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। আমার স্বামীকে

গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং তাহার নির্দ্দেশমত দুইজন সৈন্য একটি কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলে এবং আমি চীৎকার করিলে আমাকে গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। উহার পরে ঐ দুইজন সৈন্য পর্য্যায়ক্রমে বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। চেতনা লাভের পরে দেখিতে পাই যে, আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার শরীরের আঘাতের স্থানগুলি হইতে রক্তপাত হইতেছিল।"
[স্ত্রীলোকটীর উপর যখন বলাৎকার করা হয় তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন।]

রুগ্না নারীকে ধর্ষণ

[গ] মহিষাদল থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর গ্রামের শ্রীমন্মথনাথ দাসের স্ত্রী শ্রীমতী সুহাসিনী দাস নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমার বয়স ২০ বৎসর এবং কোন সন্তানাদি নাই। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী "জনৈক ব্যক্তি" একদল সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসে। উহারা আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। উপরোক্ত ব্যক্তির নির্দ্দেশক্রমে দুইজন সৈন্য একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আমার মুখ বাঁধে এবং আমি চীৎকার করিলে আমাকে গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। ঐ সৈন্য দুইজন বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করে···আমি লজ্জায় ও ঘৃণায় সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলি···আপনারা আমাকে আবার মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন।"

(এই স্ত্রীলোকটি কলেরার আক্রমণ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন)।

(ঘ) মহিষাদল থানার এলাকাধীন ডিহী মসুরিয়া গ্রামের শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাপারুর স্ত্রী শ্রীমতী বসন্তবালা মাপারু নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

"আমার বয়স ২৫ বৎসর এবং আমার একটি সন্তান আছে। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী জনৈক পুলিশের দারোগা এক দল সৈন্য লইয়া আসে। উহারা আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। উক্ত দারোগার নির্দ্দেশক্রমে তিনজন সৈন্য আমাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং আমার দিকে অগ্রসর হয়। সৈন্যরা আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং একখণ্ড কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তিনজন সৈন্যই আমায় বলাৎকার করে। ঐ সময় আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি—জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি লজ্জা অনুভব করি এবং পুনরায় সংজ্ঞাহীন হই।"

বিধবা রমণীকে ধর্ষণ

(ঙ) মহিষাদল থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর গ্রামের পরলোকগত সুশীল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী স্নেহবালা বেওয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

"আমার বয়স ২৮ বৎসর; আমার চারিটি পুত্র আছে। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী "জনৈক ব্যক্তি" কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসে। উহাদের কয়েকজনে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ধরিয়া অন্যত্র প্রেরণ করে। উপরোক্ত ব্যক্তির নির্দ্দেশক্রমে সৈন্যরা আমার কক্ষে প্রবেশ করে এবং আমাকে ধরিয়া ফেলে। সৈন্যরা একখণ্ড কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলে এবং উহার একের পর এক বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করে। আমি চেতনা হারাইয়া ফেলি, জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি দেখিতে পাই যে, আমার পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার শরীরের আঘাতের স্থানগুলি হইতে রক্ত পড়িতেছে।"

(চ) মহিষাদল থানার এলাকাধীন মাসুরিয়া গ্রামের শ্রীভুবন পাড়িয়ার স্ত্রী শ্রীমতী রাইমনী পাড়িয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

আমার বয়স ৩০ বৎসর এবং আমার একটি পুত্র আছে, ১৯৪৩ সালের

৯ই জানুয়ারী বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় "জনৈক ব্যক্তি" কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। উহারা আমার স্বামীকে ধরিয়া ফেলে। আমি নিকটবর্ত্তী একটি বাঁশ ঝাড়ের দিকে দৌড়াইয়া পালাইতেছিলাম কিন্তু দুইজন সৈন্য আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং টানিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে লইয়া আসে। ঐ সময় আমি চীৎকার করিতেছিলাম বলিয়া সৈন্যরা একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলে এবং বন্দুকের কুঁদা দিয়া আমাকে প্রহার করিতে করিতে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উহারা একের পর এক বলপূর্ব্বক—আমাকে ধর্ষণ করে।"

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরে নারী ধর্ষণের ঘটনাগুলির মধ্যে পাঁচটি স্থানেই ধর্ষিত রমণীরা একটি লোকের নামে অভিযোগ করিয়াছে এবং উহার নির্দ্দেশ ক্রমেই সৈন্যরা অত্যাচার করে। ঐ ব্যক্তিকে 'জনৈক ব্যক্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।]

নির্য্যাতনের আরও কয়টি কাহিনী

... (ক) বালুঘাটা বাজারে আমি সত্যাগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সূতাহাটা থানাতে আমাকে লইয়া যায়... রাত্রে... আমাকে বলপূর্ব্বক সিপাহী দ্বারা মাটিতে ফেলিয়া কাপড় উলঙ্গ করিয়া চূণ ও সোডাসহ লিঙ্গের উপর প্রলেপ করিয়া দেয় .....যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি বণ্ড লিখিতে বাধ্য হইলাম। বণ্ড লিখিয়া দেওয়াতে আমাকে ছাড়িয়া দেয়। লিঙ্গে চূণ সোডা দেওয়াতে ঘা ও ক্ষত হইয়া যায় এবং বাড়ীতে আসিয়া ডাক্তারী চিকিৎসা করি ও বহুদিন কষ্ট পাই... ১-৪-৪৪, শ্রীছবিলাল বেরা, সাং হাতীবেড়া' ১১ নং ইউনিয়ন সূতাহাটা থানা।

ঐ প্রকার নির্য্যাতনের আরও কয়েকটি কাহিনী পরে দেওয়া হইল।

এই নির্য্যাতনের হাত হইতে মূক পশুদেরও অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। সামরিক ব্যক্তিরা এবং পুলিশ বাহিনীর ক্রোধের মূল্য তাহাদেরও দিতে হয়। ১৯৪২ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সুতাহাটার বিশিষ্ট প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা ডাঃ জনার্দ্দন হাজরার গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। গৃহের অধিবাসীরা গৃহপালিত পশুগুলিকে বাঁচাইবার জন্য ঘর হইতে বাহিরে আনিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাদের বিতাড়িত করা হয় উক্ত গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং গৃহের সহিত পাঁচটি গাভী, পাঁচটি ছাগল, একটি মুরগী ও একটি বিড়ালও জীবন্ত পুড়িয়া মরে।

আমি শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি অন্যান্য ৭জন সত্যাগ্রহীর সহিত গত ১০।৪।৪৪ তাং বালুঘাটা বাজারে সত্যাগ্রহ করিবার কালে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হই······মহিষাদল থানায় উপস্থিত হইয়া······দারোগা আমাকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ভীষণভাবে মারপিট করে, তারপর আমাকে পুলিশের বড় কর্ত্তার নিকট তমলুক লইয়া যায়। উক্ত সাহেব আমাকে একটি আলাদা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া ভীষণভাবে বেত্রাঘাত করিতে থাকে, বেত্রাঘাতের ফলে আমার পাছায় একটি ৬ ইঞ্চি ও একটি দুই ইঞ্চি গভীর ক্ষত হইয়া যায়। তারপর আমার নখের গোড়ায় কাঁটা ফুটাইতে থাকে তারপর দুইটি "কাঠের পা" লইয়া আমার পায়ের উপর চাপ দিতে থাক, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সে আমাকে চিৎকার করিয়া শোয়াইয়া আমার পা হইতে ক্রমে বুকের উপর সবুট পা দিয়ে চাপ দেয়, সেই ভীষণ চাপের ফলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি ও আমার নাক মুখ দিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে···একটু সুস্থ হওয়ার পর আমাকে একটি বণ্ডে সই করিয়া দিবার জন্য ভয়ানক জিদ করে এবং অস্বীকার করিলে আবার প্রহার দেয়। ঐ দিন দুইবেলা

আমাকে কিছুই খাইতে দেয় নাই, অভুক্ত অবস্থায় এইরূপ নির্য্যাতন করিয়াছে তারপর আমাকে সুতাহাটা থানায় পাঠাইয়া দেয়···সেখানেও আমাকে একটি বণ্ডে সহি করিতে বলে, আমি অস্বীকার করায় আবার কিছু মারপিট করিয়াছে,···প্রহারের ফলে কয়েকদিন আমার রক্ত বাহ্য হইতেছিল······বুকের ব্যথা এখনও আছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়··· ১৯।৫।৪৪ শ্রীসতীশ চন্দ্র মাইতি সাং মছলন্দপুর, ৮নং ইউনিয়ন, মহিষাদল থানা।

(গ) গত ১৩-৯-৪৪ তারিখে তমলুক থানা ৪নং ইউনিয়ন রামতারকহাটে আমি ৫ জন সঙ্গীসহ সত্যাগ্রহ করিতে যাই। বেলা প্রায় ৭টার সময় পুলিশ আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া একটি খোলার ঘরে লইয়া যায়, সেখানে আমাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতে থাকে, আঙ্গুলের মধ্যে পেনসিল দিয়া জোরে ঘুরাইতে থাকে···অপরাহ্ণে ৫টায় আমাদিগকে তমলুক লইয়া যায়······আমাকে পুলিশের বড় কর্ত্তার বাংলোয় লইয়া যায়···তিনি আমাকে একটি শূন্য কক্ষে লইয়া গিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ করাইয়া বেত দিয়া ভীষণভাবে প্রহার করেন, কিছুক্ষণ নির্দ্দয়ভাবে প্রহারের পর আমাকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড় করাইয়া আমার গুহ্যদ্বারের মধ্যে নিজ আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া ইতস্ততঃ হেলাইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে ঘুরাইতে থাকে, ইহাতে আমি ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি ঐরূপ ভাবে ১০, ১২ মিনিট অত্যাচার করিবার পর আমাকে ছাড়িয়া দেয়···থানায় অবস্থান কালীন ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কিছুই খাইতে দেয় না তারপর ২৪ ঘণ্টা অন্তর ২বার মাত্র সামান্য ভাত খাইতে দিত··· ১৮-৫-৪৪ শ্রীক্ষুদিরাম কুইশা, সাং বিরিঞ্চিবসান, থানা মহিষাদল।

প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তিকে এই মহকুমা হইতে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের মধ্যে অনেককে দীর্ঘকাল হাজতে রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া

হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্য্যন্তও হাজতবাস করিতে হয়। বহু ব্যক্তিকেই মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ও দণ্ডিত করা হয়।

মোট কত ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা হয় তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্তও কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক ও শিশুরাও সাড়ে চার বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মহকুমার বহু ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তমলুক লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, তমলুকের জনৈক বিশিষ্ট আইনজীবী, সুতাহাটা গ্রামের ৪নং ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, সুতাহাটা থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক প্রভৃতি ব্যক্তিরাও ঐভাবে বিনা বিচারে আটক ছিলেন।

কয়েকজনের উপর বিশেষ পুলিশ অফিসার হইবার আদেশ জারি করা হয়। তাঁহাদের সপ্তাহে একবার, দুইবার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনবার পর্য্যন্ত থানায় হাজিরা দিবার আদেশ দেওয়া হয়। বহু ব্যক্তি আদেশ পালন অস্বীকার করায় তাঁহাদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গৃহ ভস্মীভূত

এই মহকুমায় ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। উহার ফলে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। জাতীয় সেনাবাহিনীর শিবির, খাদিকেন্দ্র এবং স্কুলগৃহগুলিকে ভস্মীভূত করা হয়। গৃহে অগ্নিসংযোগের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কেরোসিন ও পেট্রোল ব্যবহার করা হয়।

৪৯টি গৃহ এমনভাবে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দেওয়া হয় যে, মনে হয় উক্ত

গৃহগুলির উপর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যা চলিয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৮০৭৫ টাকা।

লুণ্ঠন

১০৪৪টী গৃহ লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য ২১২৭৯৫ টাকা। খানাতল্লাসীর অজুহাতে সরকারী ব্যক্তিরা গৃহে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা, মূল্যবান বিছানা-পত্র, নগদ টাকা কড়ি, স্যুটকেশ প্রভৃতি ঐভাবে বহু অপহৃত হয়।

সরকারী ব্যক্তিরা ২৩টি গৃহ জোর করিয়া অধিকার করে। উচ্চ ইংরাজি স্কুল, মধ্য স্কুল শিক্ষকদের ট্রেণিং স্কুলের ভবনগুলিও বলপ্রয়োগে অধিকার করা হয়।

৩৭৩০টি গৃহে খানাতল্লাস করা হয়। খানাতল্লাসকারী বাহিনীতে ১৫ হইতে ৮০ জন অবধি সশস্ত্র সৈনিক থাকিত। তাহার সহিত ঘৃণ্য চরিত্রের আরও বহু ব্যক্তিও থাকিত। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর মালিকদের পরোয়ানা দেখান হইত না।

কেহ পলায়িত আছে এই মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু উহা তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। পরে ঐ দ্রব্যগুলি অত্যাচার-কারীদের কুক্ষিগত হয়। নিরীহ ব্যক্তিদের ভয় দেখাইয়া ক্রোকের নোটীশে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয়।

সরকারী নীতির ফলে এই মহকুমার অধিবাসীদের যে ক্ষতি হয় টাকার অঙ্কে হিসাব করিলে ঐ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ টাকার মত হইবে। মোটরবাস, নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি ভারত রক্ষা আইনের অজুহাতে সরাইয়া ফেলা হয় বাড়ীঘর প্রভৃতি সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় অথবা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয় এবং

লুঠতরাজ করা হয়। সরকারী দমন নীতির ফলে অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন।

নিম্নে গুলী করিয়া হত্যা, নারী ধর্ষণ ও গৃহদাহের একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

গুলীতে হত

(ক) মহিষাদল থানার দানীপুর

(হত ৩ জন, ঘটনার তারিখ ৪।৯।৭২)

নাম	বয়স	গ্রাম
১। শশীভূষণ মান্না	—১৮	বড় অমৃতবেড়িয়া
২। সুরেন্দ্রনাথ কর	—২৮	ঐ
৩। ধীরেন্দ্রনাথ দিধর	—৩২	টীকারামপুর

(খ) নন্দীগ্রাম থানার ঈশ্বরপুর

(হত ৪ জন, আহত ১ জন, তারিখ, ২৭।৯।৪২)

নাম	বয়স	গ্রাম
৪। তারেন্দ্রনাথ মণ্ডল	—৩২	গৌরচক
৫। বালু রাণা	—৫S	বামুরাণা
৬। ভূতনাথ শাহু	—৩৫	ঐ
৭। গোবিন্দচন্দ্র দাস	—৪০	কুলুপ

(গ) নন্দীগ্রাম থানার বৃন্দাপুর

(হত ২, আহত ৩ জন)

নাম	বয়স	গ্রাম
৮। গৌরহরি কামলিয়া	—১৬	রাজাবেড়িয়া
৯। গুণধর সাহু	—৩৫	ধান্যশ্রী

(ঘ) মহিষাদল থানায়

(হত ১৩, আহত ৪৩, তারিখ ২৯৷৯৷৪২)

১০। ভোলানাথ মাইতি—৩৬ বক্সীচক
১১। শ্রীহরিচরণ দাস—৩২ ঐ
১২। আশুতোষ কুলিয়া—১৮ মাধবপুর
১৩। সুধীরচন্দ্র হাজরা—২৭ কড়ক
১৪। প্রসন্নকুমার ভুইয়া—৪৪ রাজরামপুর
১৫। পঞ্চানন দাস—৩৯ হরিখালী
১৬। দ্বারকানাথ সাহু—৫৭ তাজপুর
১৭। গুণধর হাণ্ডেল—৪০ থাকদা
১৮। সুরেন্দ্রনাথ মাইতি—২৭ নই গোপালপুর
১৯। সুরেন্দ্রনাথ মাইতি—১৬ সুন্দরা
২০। যোগেন্দ্রনাথ দাস—৩৫ ঐ
২১। রাখালচন্দ্র সামন্ত—২৩ বাঘরা
২২। ক্ষুদিরাম বেরা—৩০ চিংড়িমারি

(ঙ) তমলুক সহরের শঙ্কর আড়া পুল

থানা ও দেওয়ানী আদালতের নিকট হত ১৬, আহত ২২, তারিখ ২৯৷৯৷৪২

২৩। উপেন্দ্রনাথ জানা—২৮ খাঞ্চী
২৪। পূর্ণচন্দ্র মাইতি—২৪ ঘাটোয়াল
২৫। রামেশ্বর বেরা—৪৫ কিয়াখালী
২৬। বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী—২৫ নিকাশী
২৭। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরা—৭৩ আলিনাম
২৮। নগেন্দ্রনাথ সামন্ত—৩৩ ,,
২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—১২ মাথুরী

৩০। জীবনকৃষ্ণ বেরা—১৮ মাথুরী

৩১। পুরীমাধব প্রামাণিক—১৩ দ্বারিবেড়া

৩২। ভূষণচন্দ্র জানা—৩২ পাইকপাড়া

(চ) নন্দীগ্রাম থানা

(হত ৫, আহত ১৬, তারিখ ৩০।৯।৪২)

৩৩। বিহারীলাল কারণ—২২ আমড়াতলা

৩৪। শেখ আলাউদ্দিন—৪০ মহম্মদপুর

৩৫। পুলিনবিহারী প্রধান—২৫ সোদখালি

৩৬। বিহারীলাল হাজরা—২৪ হরিপুর

৩৭। পরেশচন্দ্র গিরি—৩০ বাহাদুরপুর

(ছ) বাসুদেবপুর—সূতাহাটা থানা

(হত ১, আহত ১৬, তারিখ—১।১০।৪২)

৩৮। ব্রজগোপাল দাস—১৭ পামা তমলুক থানার পূর্ব্বলক্ষ্যায়

(হত ২, আহত ৪, তারিখ ১৬।১০।৪২)

৩৯। বিপিনবিহারী মণ্ডল—৩২ কিসমৎপুটপুটিয়া

৪০। চন্দ্রমোহন দিণ্ডা—১৯ কিসমৎপুটপুটিয়া

নন্দীগ্রাম (ঘোলপুকুর)

(হত ১, আহত ৩ ; তারিখ ৮।১০।৪২)

৪১। মুচীরাম দাস—৪০ বিরুলিয়া

[মহিষাদল থানার শ্রীকৃষ্ণপুরে আহত ১,]

তমলুক হাসপাতালে মৃত নিহতের মোট সংখ্যা—৪১, আহতের মোট সংখ্যা—৯৯।

নারীধর্ষণ

সূতাহাটা থানা

সংখ্যা	নাম	বয়স	গ্রাম	তারিখ	পর পর কত-জনের দ্বারা ধর্ষিতা	মন্তব্য
১।	কমলাবালা দোলই	১৬	দেউলপোতা	৬।১।৪৩	২	
২-৬।	আরও ৫জন নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক					
	তমলুক থানা					
৭।	মহিলা ট্রেণ আরোহী	১৮	মোবেদা ষ্টেশন	৬।১০।৪২	১	
৮।	ঐ	৩০	ঐ	ঐ	১	
৯।	জনৈকা ভদ্রমহিলা	৩৬	বড়গাছা	৯।১০।৪২	১	
	নন্দীগ্রাম					
১০।	উমাচাঁদ দাসের স্ত্রী	২৫	পুরুষোত্তমপুর	১।১০।৪২	২	গর্ভবতী
১১।	বিনোদিনী দাস	২৮	তিহিকাশিমপুর	১।১০।৪২		
১২।	মণীন্দ্র জানার স্ত্রী	২২	ভগবানখালী	ঐ		
১৩।	জনৈকা ভদ্রমহিলা	২৯	রাণীচক	১০।১২।৪২		
১৪।	শৈলবালা					
১৫-১৮।	নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক					
১৯।	চারুবালা করণ	৫০	লক্ষ্যা	২৮।১০।৪২	১	
২০।	কমলা ভৌমিক	২২	চণ্ডীপুর	২৭।১০।৪২	১	
২১।	চারুবালা হাজরা	২৫	ঐ	ঐ	১	
২২।	কুসুমকুমারী হাজরা—		ঐ	ঐ	১	
২৩।	সিন্ধুবালা মাইতি		ঐ	ঐ	২	

সংখ্যা	নাম	বয়স	গ্রাম	তারিখ	পর পর কত-জনের দ্বারা ধর্ষিতা	মন্তব্য
২৪।	জনৈকা মহিলা	২৩	চূণাখালী	১-১-৪৩	১	
২৫।	জনৈকা বিধবা	২৫	তেঁতুলবেড়্যা	৩-১-৪৩	১	
২৬।	গুণধর মাজীর স্ত্রী	২৫	পূর্ব্ব শ্রীরামপুর	৩-১-৩৩		
২৭।	কাননবালা মাইতি	১৯	মাশুরিয়া	৯-১-৪৩	১	
২৮।	কিশোরীবালা কুইলা	১৯	ঐ	ঐ	২	
২৯।	হিরণবালা কুইলা	১৭	ঐ	ঐ	৩	
৩০।	দেওয়ানী বেরা	২৪	ঐ	ঐ	২	
৩১।	চারুবালা দাস	১৪	ঐ	ঐ	২	
৩২।	অম্বিকাবালা মাইতি	১৬	ঐ	ঐ	১	
৩৩।	রাজবালা বেরা	১৫	ঐ	ঐ	১	
৩৪।	কুসুমকুমারী বেরা	৩২	ঐ	ঐ	১	
৩৫।	ভগীবালা দেই	১৯	ঐ	ঐ	২	বিধবা
৩৬।	টুকুবালা বেরা	১৬	ঐ	ঐ	৩	
৩৭।	রাসমণি পাল	ঐ	ঐ	ঐ	১	
৩৮।	কিরণবালা কুইলা	২৬	ঐ	ঐ	১	
৩৯।	শৈলবালা	২২	ঐ	ঐ	১	
৪০।	চিকনবালা মণ্ডল	১৬	ঐ	ঐ	২	
৪১।	কিরণবালা গায়েন	১৯	ঐ	ঐ	২	
৪২।	স্নেহবালা দিন্দা	১৫	ঐ	ঐ	১	
৪৩।	পুঁটীবালা ধাড়া	২৯	ঐ	ঐ	১	
৪৪।	রাইমণি পড়্যা	৩০	ঐ	ঐ	১	

সংখ্যা	নাম	বয়স	গ্রাম	তারিখ	পর পর কতজনের দ্বারা ধর্ষিতা	মন্তব্য
৪৫।	কিরণবালা সীট	৩১	মাশুরিয়া	৯-১-৪৩	২	
৪৬।	সুশীলাবালা পাল	২২	ঐ	ঐ	২	
৪৭।	দ্রৌপদী মাজী	২৪	ঐ	ঐ	১	
৪৮।	নীরদাবালা দেই	৩৫	ঐ	ঐ	২	বিধবা
৪৯।	শৈলবালা মাইতি	২২	ঐ	ঐ	৩	
৫০।	প্রমদাবালা ভৌমিক	২৫	চণ্ডীপুর ঐ	ঐ	৩	
৫১।	চারুবালা হাজরা	২৪	ঐ	ঐ	২	
৫২।	শোভাবতী ভৌমিক	২৪	ঐ	ঐ	৩	
৫৩।	প্রভাবতী ভৌমিক	২১	ঐ	ঐ	২	
৫৪।	করুণাবালা ভৌমিক	২১	ঐ	ঐ	১	
৫৫।	প্রমীলাবালা ভৌমিক	২০	ঐ	ঐ	২	
৫৬।	রাজবালা ভৌমিক	২৫	ঐ	ঐ	২	
৫৭।	স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়	২৫	ঐ	ঐ	২	বিধবা
৫৮।	সুবাসিনী দাস	২০	ঐ	ঐ	২	
৫৯।	ক্ষুদিবালা পণ্ডিত	২৪	ঐ	ঐ	২	গর্ভবতী
৬০।	যশোমতী মাইতি	২৮	ঐ	ঐ	২	
৬১।	সত্যবালা সামন্ত	৪১	ডিহিমাশুরিয়া	ঐ	২	
৬২।	বিমলা সামন্ত	২৪	ঐ	ঐ	২	
৬৩।	জ্ঞানদা	২৮	ঐ	ঐ	২	
৬৪।	গুণীবালা বর	৩১	ঐ	ঐ	৪	
৬৫।	কমলাবালা মাইতি	১৭	ঐ	ঐ	২	

সংখ্যা	নাম	বয়স	গ্রাম	তারিখ	পর পর কতজনের দ্বারা ধর্ষিতা	মন্তব্য
৬৬।	রাইকিশোরী বর	২২	ডিহিমাশুরিয়া	৯-১-৪৩	২	
৬৭।	নীরোদবালা পাল	২২	ঐ	ঐ	১	
৬৮।	পুঁটিবালা বর	২৭	ঐ	ঐ	২	
৬৯।	গঙ্গাবালা দেই	১৬	ঐ	ঐ	২	
৭০।	অহল্যাবালা	১৬	ঐ	ঐ	—	
৭১।	বসন্তবালা	—	ঐ	ঐ	—	
৭২।	সিন্ধুবালা মাইতি	১৯	চণ্ডীপুর	ঐ	১*	
৭৩।	সত্যবালা দেই	১৮	ফট্রাটিকরী	৫।২।৪৪	২	

গৃহদাহ

সূতাহাটা থানা

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
১।	ডাঃ জনার্দ্দন হাজরা	সীতাবেড়্যা	৩।১০।৪২	৩,০০০৲	
২।	অমূল্যচরণ খাটুয়া	অনন্তপুর	ঐ	৬,০০০৲	
৩।	অনিলকুমার খাটুয়া	ঐ	ঐ	৬,০০০৲	
৪।	যতীন্দ্রনাথ খাটুয়া	ঐ	ঐ	৬,৫০০৲	
৫।	অশ্বিনীকুমার খাটুয়া	ঐ	ঐ	৬,০০০৲	
৬।	যতীন্দ্রনাথ মাইতি	রাজারামপুর	ঐ	১,০০০৲	
৭।	ভুবন বেরার আর্য্যমিশন গৃহ	রামগোপাল চক	৬।১০।৪২	১৫০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৮।	কানাই লাল জানার খদ্দরের দোকান	চৈতন্ত পুর	৬-১০-৪২	২,০০০৲	
৯।	ভূষণ বেরা	রামগোপাল চক	ঐ	২০০৲	
১০।	কোকিলচন্দ্র দাস	পানা	৭-১০-৪২	২০০৲	
১১।	সুরেন্দ্রনাথ দাস	ঐ	ঐ	২০০৲	
১২।	তারকচন্দ্র প্রামাণিক	বিরিঞ্চি বেড়্যা	৮-১০-৪২	৫০০৲	
১৩।	ধৈর্য্য প্রামাণিক	ঐ	ঐ	৭০০৲	
১৪।	ক্ষেত্র প্রামাণিক	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
১৫।	গোষ্ট প্রামাণিক	ঐ	ঐ	৮৫৫৲	
১৬।	রামহরি প্রামাণিক	ঐ	ঐ	৩২৫৲	
১৭।	তারিণীকুমার তুঙ্গ	ভুঞারায় চক	ঐ	১৪,০০০৲	
১৮।	ননীগোপাল সামন্ত	ঐ	ঐ	৮০০৲	
১৯।	হৃষীকেশ বড়া	ঐ	ঐ	৪০০৲	
২০।	যামিনীকান্ত মাজী	জয়নগর	৯।১০।৪২	৯৫০০৲	
২১।	উপেন্দ্রনাথ বেরা	ঐ	ঐ	৮০০৲	
২২।	অম্বিকাচরণ ঘড়া	ঐ	ঐ	৭,০০৲	
২৩।	বসন্তকুমার ঘড়া	ঐ	ঐ	৫৫০৲	
২৪।	ভূষণচন্দ্র ঘড়া	ঐ	ঐ	৫৫০৲	
২৫।	শরৎচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ	৬৫০৲	
২৬।	ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
২৭।	মুকুন্দলাল মাইতি	ঐ	ঐ	৩০০৲	
২৭।	ইন্দ্রনাথ মান্না	ঐ	ঐ	৩৫০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
২৯।	ভূতনাথ ঘড়া	জয়নগর	৯।১০।৪২	৩৫০৲	
৩০।	গজেন্দ্রনাথ ঘড়া	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
৩১।	ধীরেন্দ্রনাথ ঘড়া	ঐ	ঐ	৩৫৯৲	
৩২।	বিভূতিভূষণ বেরা	ঐ	ঐ	৭৫০৲	
৩৩।	গুরাইচন্দ্র বেরা	ঐ	ঐ	২৫০৲	
৩৪।	মন্মথনাথ বেরা	ঐ	ঐ	৫০০৲	
৩৫।	গুণধর বেরা	ঐ	ঐ	৭০০৲	
৩৬।	মন্মথনাথ বেরা (ছোট)	ঐ	ঐ	৮০৯৲	
৩৭।	ননীগোপাল বেরা	ঐ	ঐ	৮০০৲	
৩৮।	একাদশী বেরা	ঐ	ঐ	২৫০৲	
৩৯।	যতীন্দ্রপ্রসাদ ঘড়া	ঐ	ঐ	৭০০৲	
৪০।	রাখালচন্দ্র ঘড়া	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
৪১।	মুক্তিশোপান গৃহ	হাদিয়া	১৫।১০।৪২	৫০০৲	
৪২।	বিনোদ বিহারী মাইতি	ব্রজলাল চক	ঐ	১,০০০৲	
৪৩।	হরিজন বিদ্যালয়	ঈশ্বরদা	ঐ	৩০০৲	

মহিষাদল থানা

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৪৪।	থানা কংগ্রেস অফিস	সুন্দরা	৫-১০-৪২	১,০০০৲	
৪৫।	নীলমণি হাজরা	রাজারামপুর	১৫-১০-৪২	৮৫০৲	

নন্দীগ্রাম থানা

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৪৬।	কংগ্রেস অফিস	ঈশ্বরপুর	২৯-৯-৪২	৫০০৲	
৪৭।	গিরিশচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ	১৫০৲	
৪৮।	নীলকণ্ঠ দাস	ঐ	ঐ	১৫০৲	
৪৯।	শশীভূষণ ভূঞা	হানুভূঞা	৮-১০-৪২	২০০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৫০।	কংগ্রেস অফিস	ঘোলপুকুর	৮-১০-৪২	৫০০৲	
৫১।	হারাধন প্রধান	চণ্ডীপুর	১ -১০-৪২	৩০০৲	
৫২।	মাখনলাল মিড্ডা	রতনপুর	১২-১০-৪২	২৫০৲	

সূতাহাটা থানা (ঝড়ের দিন)

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৫৩।	সতীশচন্দ্র মাইতি	বাবুপুর	১৬-১০-৪২	৩,০০০৲	
৫৪।	আশুতোষ মাইতি	ঐ	ঐ	২,৫০০৲	
৫৫।	মৃগেন্দ্রনাথ মাইতি	ঐ	ঐ	২,০০০৲	
৫৬।	পূর্ণচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ	২৫০৲	
৫৭।	কেদারনাথ দাস	ঐ	ঐ	৪০০৲	
৫৮।	ভগবতীচরণ মাইতি	চৈতন্যপুর	ঐ	২,০০০৲	

সূতাহাটা থানা (ঝড়ের পর)

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৫৯।	শ্রীধরচন্দ্র সাহু	বাবুপুর	২৩-১০-৪২	১০০৲	
৬০।	পূর্ণচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ	৪০০৲	দ্বিতীয় বার
৬১।	শচীন্দ্রনাথ নায়েক	ঐ	ঐ	১০০৲	
৬২।	কেদারনাথ দাস	ঐ	ঐ	১৯০৲	দ্বিতীয় বার
৬৩।	সতীশচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ	১০০৲	ঐ
৬৪।	যতীন্দ্রনাথ জানা	গুয়া বেড়্যা	২৪-১০,৪২	১,০০০৲	
৬৫।	সুকুমার মাইতি	আমলাট	ঐ	৩,০০০৲	
৬৬।	কেদারনাথ মাইতি	বাড়ধান্যবাটা	ঐ	১,০০০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৬৭।	পরেশচন্দ্র মাইতি	বাড়ধান্যবাটা	২৪-১০-৪২	২০০৲	
৬৮।	ভুবনচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ	২০০৲	
৬৯।	যোগেন্দ্রনাথ মাল	ঐ	ঐ	২৫০৲	
৭০।	শ্রীধরচন্দ্র মণ্ডল	মুরারীচক	ঐ	২,০০০৲	
৭১।	পঞ্চানন মণ্ডল	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
৭২।	দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত	ঐ	ঐ	১,৫০০৲	
৭৩।	সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত	ঐ	ঐ	১,০০০৲	
৭৪।	ইন্দ্রনারায়ণ সামন্ত	ঐ	২৪-১০-৪২	১,৫০০৲	
৭৫।	কৃষ্ণপ্রসাদ বেরা	ঐ	ঐ	৬০০৲	
৭৬।	কালীপদ বেরা	ঐ	ঐ	৩০০৲	
৭৭।	নাট্য মন্দির	ঐ	ঐ	৩০০৲	
৭৮।	মহেন্দ্রনাথ বেরা	ঐ	ঐ	৭০০৲	
৭৯।	ভুবনচন্দ্র মাইতি	পানা	২৬-১০-৪২	২০০৲	
৮০।	মুকুন্দলাল মান্না	ঐ	ঐ	২৫০৲	
৮১।	পঞ্চানন মান্না	ঐ	ঐ	২০০৲	
৮২।	নগেন্দ্রনাথ সীট	ঐ	ঐ	১৫০৲	
৮৩।	অবিনাশচন্দ্র মাইতি	দ্বারিবেড়া	ঐ	১০০৲	
৮৪।	নন্দলাল ভূঞ্যা	পানা	ঐ	৫০০৲	

মহিষাদল থানা

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৮৫।	শরৎচন্দ্র বাগ	গোয়ালবেড়্যা	২৪-১০-৪২	১,০০০৲	
৮৬।	কংগ্রেস অফিস	চুণাখালী	২৭-১০-৪২	৩০০৲	
৮৭।	নন্দলাল দাস	বেতকুণ্ড	২৯-১০-৪২	২,০০০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
৮৮।	গজেন্দ্রনাথ দাস	বেতকুণ্ড	২৯-১০-৪২	২,০০০৲	
৮৯।	সুরেন্দ্রনাথ দাস	ঐ	ঐ	২,০০০৲	
৯০।	মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক	চণ্ডীপুর	ঐ	৬০০৲	
৯১।	হৃষীকেশ ভৌমিক	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
৯২।	নীলমণি মাইতি	লক্ষ্যা	৩০-১০-৪২	২০০৲	
৯৩।	প্রবোধচন্দ্র বেরা	ঐ	ঐ	৫০০৲	
৯৪।	শ্রীধরচন্দ্র জানা	ঐ	ঐ	১,০৫০৲	
৯৫।	পঞ্চানন বেরা	কালিকাকুণ্ড	ঐ	১,১০০৲	
৯ ।	ভূপতিচরণ পাত্র	ঐ	ঐ	১,২৫০৲	
৯৭।	সৎপতিচরণ পাত্র	ঐ	ঐ	১,২০০৲	
৯৮।	প্রভাতচন্দ্র কুইলা	ঐ	ঐ	১,৪০০৲	
৯৯।	মন্মথনাথ কুইলা	ঐ	ঐ	১,০০০৲	
১০০।	অতুলচন্দ্র কুইলা	ঐ	ঐ	৩০০৲	
১০১।	হীরালাল কুইলা	ঐ	ঐ	৩০০৲	
১০২।	ভূতনাথ কুইলা	ঐ	ঐ	২৫০৲	
১০৩।	ধনুর্ধ্বজ কুইলা	ঐ	ঐ	১,২০০৲	
২০৪।	পুলিনবিহারী কুইলা	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
১০৫।	মহেন্দ্রনাথ কুইলা	ঐ	ঐ	৫৫০৲	
১০৬।	ধীরেন্দ্রনাথ কুইলা	ঐ	ঐ	৮০০৲	
১০৭।	পঞ্চানন কুইলা	ঐ	ঐ	৩৫০৲	
১০৮।	আশুতোষ গুড়্যা	ঐ	ঐ	২০০৲	
১০৯।	আশুতোষ জানা	লক্ষ্যা	ঐ	৫০০৲	

সংখ্যা	গৃহস্বামীর নাম	গ্রাম	ক্ষতি করিবার তারিখ	ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
	নন্দীগ্রাম থানা				
১১০।	জবাকুসুম ভক্তদাস	দাস্তশ্রী	১৭-১০-৪২	৪,৬০০৲	
১১১।	সতীশচন্দ্র সাহু	খোদামবাড়ী	৩০-১০-৪২	১,৫০০৲	
১১২।	মৃত্যুঞ্জয় সাহু	ঐ	ঐ	১,৫০০৲	
১১৩।	বিহারীলাল সাহু	ঐ	ঐ	১৫০৲	
১১৪।	সৃষ্টিধর পাল	দাস্তশ্রী	ঐ	১৫০৲	
১১৫।	সুধীরচন্দ্র দাস	বাবুইয়া	২-১১-৪২	৩০০৲	
১১৬।	বলরাম দাস	ঐ	ঐ	৭০০৲	

তমলুক জাতীয় সরকারের সর্ব্বাধিনায়কগণ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত মহিষাদল থানার ৮নং ইউনিয়নের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সামন্ত মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় সন্তান।

মহিষাদলে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠকালে বরিশালের সুবিখ্যাত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর (বেদান্তদর্শন, মহিম্নস্তোত্র, সবলতা দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রণেতা) সংস্পর্শে আসেন। ঐ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সরকারের আদেশে মহিষাদলে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। সতীশবাবু প্রজ্ঞানন্দজীর এত প্রিয় ছিলেন যে, রাজনৈতিক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি স্বামীজী তাঁহার দ্বারাই লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি সে সময় কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক শ্রীযুক্ত সামন্ত দেশবন্ধুর নির্দ্দেশ ক্রমে তমলুক হইতে ৩ মাইল দূরে নিমতৌরীতে 'দেশবন্ধু পাঠাগার' নাম দিয়া একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয় পরিচালনে যে অর্থ ব্যয় হইত তাহা তিনি ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারাই তিনি বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি জলাশয়ও খনন করাইয়াছিলেন। নিমতৌরীর কাছাকাছি সোনামুখী ও শ্রীকৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থানে বহু মুসলমানের বাস আছে। শ্রীযুক্ত সামন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে নির্ব্বিচারে সকলের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবায় ও সরল সান্ত্বনাবাক্যে গ্রামবাসীরা সকলেই মুগ্ধ হয়। তিনি বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধও বিতরণ করিতেন ও অন্যান্য নানা প্রকারে গ্রামবাসীদের সেবা করিতেন।

১৯৩০ সালের মরহাট থানায় 'লবণ আইন অমান্য' সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের অপরাধে তাঁহাকে ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর তিনি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহাত্মা গান্ধী যখন হরিজনদের জন্য অনশন অবলম্বন করেন সেই সময় তিনিও মহাত্মাজীর সহিত ৫।৬ দিন সহানুভূতিসূচক অনশন করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর কথায় পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে তিনিও এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ফলে তাঁহাকে ১বৎসরের জন্য কারা ভোগ করিতে হয়। কারামুক্তির পরই তিনি আবার স্বদেশের মুক্তি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

অতঃপর তিনি তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত

হন। পাঁশকুড়া থানায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপের সময় তিনি সেস্থানে উপস্থিত থাকিয়া রোগগ্রস্তদের যথেষ্ট সেবা ও সাহায্য করিতেন।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচনে তিনি যথেষ্ট কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন কার্য্য পরিচালনার পর তাঁহাকে মেদিনীপুর সদরে সাত দিন আটক রাখা হইয়াছিল।

১৯৪০ সালে মহকুমার অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াই বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্যে রত হন। কিন্তু অতি শীঘ্রই গভর্নমেণ্টের মতলব বুঝিতে পারিয়া আত্মগোপন করেন। এই আত্মগোপন অবস্থায় ৪র্থ সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুশীল ধারা প্রভৃতির সহযোগিতায় তাম্রলিপ্তে আজাদ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই আজাদ সরকারের পররাষ্ট্রীয় বিভাগ পরিচালনের কার্য্যে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হয়।

কলিকাতায় পররাষ্ট্রীয় বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের সহিত তাঁহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সেখান হইতে তমলুক আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হইলে পর বিচারকের সম্মুখে নিজেকে স্বাধীন দেশের প্রজা এবং সেই হেতু নিজেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরোধী রাষ্ট্রের সহিত সংস্রবশূন্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ফলে তাঁহার আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি পুনরায় তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং মহাত্মা গান্ধীজীর তমলুক পরিদর্শন কালে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাজ করেন।

শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত কুইতি

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত কুইতি মহিষাদল থানার অন্তর্গত নন্দকুমার গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই তিনি ডাক্তারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটিতে যোগদান করেন।

তিনি লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং করদান বিরোধী আন্দোলনে একটি একাগ্রভাবে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মহিষাদল থানা হইতে এবং পরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

অতঃপর তিনি সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে উক্ত দল পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় তমলুক মহকুমা কংগ্রেসে যোগদান করেন।

প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্তের গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে দ্বিতীয় সর্ব্বাধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়। কিছু কালসুষ্ঠুভাবে জাতীয় সরকারের কার্য্য পরিচালনার পর তিনি বৃটিশ সরকারের হস্তে বন্দী হন।

শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র ধারা

মহিষাদল থানার ৪ সংখ্যক ইউনিয়নের টিকারামপুর গ্রাম নিবাসী তরেন্দ্রনাথ ধারার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ধারা ছাত্র জীবনে ছুটির সময়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সেবাকার্য্য করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি দুঃস্থ আতুরের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। বাল্যকাল হইতেই জুজুৎসু, লাঠি ও ছোরা খেলা প্রভৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও অসামান্য পারদর্শিতা ছিল।

সুশীলচন্দ্র ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তমলুক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আই-এ পড়িতে আসেন। আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র জানা (বর্ত্তমানে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি) মহাশয়ের বাসুদেবপুর আশ্রমে থাকিয়া চরকা চালনা প্রভৃতি গান্ধীজী অনুমোদিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিছু কাল ঐ স্থানে কাটাইয়া

১৯৩৪ সালে বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় গমন করেন কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া পুনরায় বাসুদেবপুর আশ্রমে গিয়া গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বাল্যকালে তমলুকে অবস্থানের সময় হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠীত নিমতাড়া বিদ্যালয়ে যাইতেন এবং উক্ত নেতৃদ্বয়ের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বহু দেশপ্রেমপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ফলে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয় স্বদেশ প্রেমে পূর্ণ ছিল। গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার পর দেশ সেবার জন্য তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। এই সময় তিনি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর তিনি মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সুন্দর গ্রামে কংগ্রেস ক্যাম্প স্থাপিত হইলে উনি উক্ত ক্যাম্পে বহু সুমনোনীত মহাজন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কাগজের উপর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া তদ্দ্বারা ক্যাম্পগৃহের শোভা ও গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি "বিদ্যুৎ বাহিনী" ও "ভগ্নীবাহিনী" গঠন করেন। শ্রীযুক্ত কুমারজানার গ্রেপ্তারের পর সুতাহাটি থানার পরিচালন ভারও তাহার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সর্ব্বত্রই স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্যে নরনারী সকলে তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল।

লবণ আইন অমান্য, মাদক বর্জ্জন, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রভৃতি আন্দোলনে যোগদান করার ফলে তাঁহাকে বারংবার কারাবরণ করিতে হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সুশীল চন্দ্রের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির হইলে তিনি আত্মগোপন করেন, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি পুনরায় ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু কারাদণ্ড সুশীল চন্দ্রের জীবনে অবসাদ আনে নাই বরঞ্চ উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর আগষ্ট প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যুৎবাহিনী এবং জনসাধারণকে লইয়া তিনি উক্ত অঞ্চল হইতে বৈদেশিক বৃটিশ শাসন বিলোপ সাধনের জন্য মহিষাদল থানা আক্রমণ করেন। কিন্তু স্থানীয় জমিদার মহিষাদলের মধ্যম কুমারের দেহরক্ষী পাঠান জী সাহেব জমিদারের আদেশক্রমে রাইফেল সহ পুলিশের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং ক্রমাগত রাইফেলের গুলীবর্ষণ করিতে থাকায় বহুলোক হতাহত হয়। পাঁচ বার থানা আক্রমণ করিয়াও সফল হইতে না পারিয়া বিদ্যুৎবাহিনীসহ তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। ইহার পর হইতে তিনি শুধু যে বৃটিশ সরকারের শত্রু হন তাহা নহে পরন্তু তিনি ধনতন্ত্রেরও প্রবল শত্রু হইয়া উঠেন। জমিদার অনুমোদিত জী সাহেবের কার্য্যে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি জমিদারের বহু শস্যাগার লুণ্ঠিত করাইয়া দেন। এবং ধনীমাত্রেই বিদেশী সরকারের পরিপোষক—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যুৎবাহিনীর খরচের জন্য ধনীমাত্রেরই উপর নোটিশ দিয়া টাকা আদায় করিতে থাকেন। এই সময় অন্যান্য থানাগুলিতেও অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগের কার্য্য আরম্ভ হয় কিন্তু সাইক্লোন এবং বন্যার ফলে সমস্ত বিধস্ত হইয়া যাওয়ায় উক্ত পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হয় এবং জনসেবা ও বন্যা বাত্যা বিধস্ত অঞ্চলের সেবাকার্য্যে বিশেষভাবে মন দিতে থাকেন। সুশীল বাবু নিজেই মহিষাদল এই সুতাহাটা থানার পাশ দিয়া প্রবাহিত রূপনারায়ণ এবং হুগলী নদীর বাঁধ বাঁধার কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী হন। বন্যার ফলে খাদ্যাদি সব ভাসিয়া যাওয়ায় নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা

দেয়। সুশীল চন্দ্র লোককে বাঁধ বাঁধার কার্য্যে পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থের বদলে চাউল দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে বহু দূর দূরান্ত হইতে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহাকে চাউল সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট জেলা হইতে সমস্ত চাউলই একরূপ সরাইয়া লইতে আরম্ভ করায় তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ হয়। এই সময় সমগ্র মহকুমায় তাণ্ডব চলিতেছিল।

মহকুমা কংগ্রেস কমিটির এক গোপন অধিবেশনে সমগ্র মহকুমাব্যাপী সমূহ ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেবাকার্য্য চালাইবার সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য সমগ্র মহকুমার উপযুক্ত ব্যক্তিদের লইয়া বিদ্যুৎ বাহিনী পুনর্গঠন করার প্রয়োজন অনুভব হয়। সুশীলবাবু নিজে মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটা এই তিন থানার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াও পাঁশকুড়া ও ময়না থানা হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

মহকুমা কংগ্রেসের আর একটি গোপন অধিবেশনে তাম্রলিপ্তে আজাদ সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং প্রত্যেক থানা ও মহকুমার মুখপত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বিপ্লবী" নাম দিয়া দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় সুশীলবাবু সমগ্র মহকুমা বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

আজাদ সরকারের কার্য্যে ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে সুশীল-বাবু উক্ত বিদ্যুৎ বাহিনীকেই আজাদ সরকারের পুলিশ বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া সেনা বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মহকুমা আজাদ সরকারের প্রথম ডিক্টেটর সতীশ চন্দ্র সামন্ত; দ্বিতীয় ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত কুইতি এবং পরে তৃতীয় ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহু মহাশয়ের কারাবরণের পর সুশীল বাবুই বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়কত্ব

পরিত্যাগ করিয়া আজাদ সরকারের সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত গোপীনন্দন গোস্বামী বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই সময় বৃটিশ সরকারের হস্তে বন্দী হইবার পর তমলুক হইতে তিনি পলায়ন করেন। সুশীলবাবু সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে অল্প কিছু দিন কাজ করার পর মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে আজাদ সরকারকে বাতিল ঘোষণা করিয়া বৃটিশ সরকারের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে তিনি এক গোপন অধিবেশন মহকুমার অবশিষ্ট কর্ম্মিগণের হাতে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া "বিপ্লবী" সংবাদ পত্র এবং আজাদ সরকারের অবসান ঘোষণা করিয়া আদালতের বিচারে স্বেচ্ছায় বিদ্যুৎ বাহিনীর সমস্ত দায়িত্ব, সর্ব্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ শাসনের দ্বারা বিচারের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। বিদ্যুৎ বাহিনীর দায়িত্ব, সর্ব্বাধিনায়কের দায়িত্ব ও বৃটিশ সরকারকে অস্বীকার করার অভিযোগে প্রতিটি অপরাধের জন্য আড়াই বৎসর হিসাবে সাড়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বন্দী অবস্থায় তমলুক হইতে পলায়নের অপরাধে তিনি আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সর্ব্বহারা মানবের দরদী বন্ধু সুশীলচন্দ্র বর্ত্তমানে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে দণ্ডভোগ করিতেছেন।

কাঁথি

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কাঁথি মহকুমায় যে আন্দোলন চলিয়াছিল তৎসম্পর্কে তদন্ত করিয়া কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি এক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। এই রিপোর্টে কাঁথি মহকুমায় প্রায় তিন মাসব্যাপী আগষ্ট আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহার মাইতি এম, এল, এ, কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রাসবিহারী পাল ইহার সেক্রেটারী ও শ্রীযুক্ত কাঙ্গালচন্দ্র গিরি, এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী।

এই আন্দোলন সম্পর্কে গুলীবর্ষণ, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, ধরপাকড় প্রভৃতির যে সকল বিবরণ রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ও ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) গুলীবর্ষণের ফলে মৃত্যু—৩৯ ; (২) গুলীবর্ষণের ফলে আহত —১৭৫ ; (৩) নারীধর্ষণ, অথবা নারীধর্ষণের চেষ্টা—২২৮ ; (৪) গৃহদাহের সংখ্যা—৯৬৫ ; (৫) গৃহদাহের ফলে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ—৫,৪১,৪৩৪ টাকা ; (৬) গ্রেপ্তারের সংখ্যা (যে সব লোককে বে-আইনীভাবে আটক করিয়া উৎপীড়ন করার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগকে ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে)—১২,৬৮১ ; (৭) দণ্ডিতের সংখ্যা—৬৭২ ; (৮) লুণ্ঠিত গৃহের সংখ্যা—২০৫৯ ; (৯) লুঠতরাজের ফলে ক্ষতির পরিমাণ—৩৫৫২৪৬ টাকা ; (১০) লাঠির আঘাতে ঘায়েল লোকের সংখ্যা—৬৬৮৫ ; (১১) পাইকারী জরিমানা—৩০০০০ টাকা ; (১২) স্পেশ্যাল কনষ্টেবলের সংখ্যা—৪৩৮ ; (১৩) গৃহত্যাগিনী স্ত্রীলোকদের সংখ্যা (মুসলমানের সাহায্যে)—১০।

আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় ও গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা

বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির স্মরণীয় অধিবেশনের প্রাকালে ১৯৪২ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হয়। পরদিন কংগ্রেসকর্ম্মিগণ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহের মর্ম্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে মফঃস্বল অঞ্চলে যাত্রা করেন। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মুহূর্ত্তেই মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ কংগ্রেস কর্ম্মীদের নিকট পৌছায় এবং ১৪ই আগষ্ট তারিখে এই সব গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পটাসপুর, ভগবানপুর ও খেজুরী থানার এলাকায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করে ও সহরের রাজপথে মিছিল বাহির করে। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী থাকাকালে শ্রীযুত মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় ১৬ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এক শোক সভা হয়। ২২শে আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কাঁথিতে সাফল্যমণ্ডিত হরতাল প্রতিপালিত হয়। পরদিবস প্রাতঃকালে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এম, এল, এ, কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত রাসবিহারী পাল এবং শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এম, এল, এ, কে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বিপিনবিহারী অধিকারী (উকীল), শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত সুবোধ গোপাল গুছাইতকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাঁহারা দণ্ডিত হন। ২৩শে আগষ্ট তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পুনরায় সাফল্য-মণ্ডিত হরতাল হয় এবং ঐদিন প্রাতঃকালে শ্রীপ্রবীরকুমার জানা ও শ্রীবনবিহারী জানা নামক দুইজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা

হয়। ২৭শে আগষ্ট তারিখে পদ্মপুকুরিয়াতে এক জনসভা হয় এবং কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি ও শ্রীযুত অমিয়কুমার মাইতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহারা দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৮শে আগষ্ট তারিখে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে হানা দিয়া সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করা হয় ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কাঁথি থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং ভয় দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা

মহকুমার সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের কর্মসূচী বিবৃত করিবার জন্য শত শত জনসভার অনুষ্ঠান হইতে থাকে এবং মহকুমার প্রায় সকল গ্রামেই অসংখ্য শোভাযাত্রা করা হয়। আনুমানিক ৮ সহস্র লোক স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হয় এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতি ইউনিয়নে, (বিরাশীটি) শিবির স্থাপন করা হয়। অতি ব্যাপক আকারে সংগঠন চলিতে থাকে এবং মহকুমায় এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে সংগঠন করা হয় নাই। পুলিশ অধিকাংশ সভাতেই উপস্থিত থাকিতে সাহস করিত না; আর উহারা উপস্থিত থাকিলেও কোন বক্তাকে গ্রেপ্তার করিতে ভয় করিত। ইহার ফলে মহকুমায় অবস্থিত সমুদয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজ ছাত্রশূন্য হইয়া পড়ে। কলেজ ও স্কুলের বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হয়। হলুদবাড়ী হাই স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীবিরেন্দ্রনাথ মাল, ভগবানপুর গুলী বর্ষণে নিহত পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ (ভীমেশ্বরী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত) ও অপর একজন শিক্ষক

ও অন্যান্য অনেকে কর্মত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

১৯৪২ সালের ১৪ই সেপ্টম্বর তারিখে মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ১০ হাজার লোকের ২০ টি শোভাযাত্রা বেলা তিনটার সময় ৮ টা রাজপথ দিয়া ঠিক একই সময়ে কাঁথি সহরে প্রবেশ করে। এই ধরণের ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং মহকুমার সর্ব্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভীতিগ্রস্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা কালবিলম্ব না করিয়া অফিসের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। পুলিশও শোভাযাত্রীদের চলাচলে কোন বাধা দেয় নাই। বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বাজার সমূহ বন্ধের জন্য চেষ্টা করা হয়। তরিতরকারী, চাউল, মাছ প্রভৃতির বিক্রেতাদিগকে মহকুমা সহরে না আসিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২০শে আগষ্ট হরতাল করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। একমাত্র কাঁথির প্রভাত কুমার কলেজ ও অপর কয়টি স্কুলে পিকেটিং ও ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। পুলিশ স্কুলের দরজায় ৪০ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করে; এগরায় পিকেটিং-এর পর তৎকালীন মহকুমা হাকিম সমর সেনের নেতৃত্বে পুলিশদল দোকানদারদের গুরুতর প্রহার করে। এই প্রকার পিকেটিং-এর ফলে কলেজ ও স্কুল সমূহ বন্ধ হইয়া যায়। ৬ই সেপ্টেম্বর মহকুমা হাকিম যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ নৃত্যের ব্যবস্থা করে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা জন সাধারণকে উহাতে যোগ না দিতে অনুরোধ করে। শোভাযাত্রীদের কালবিলম্ব না করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়, উহাদের মধ্যে তিনজনের শাস্তি হয় এবং অন্যান্য সকলে মুক্তি পায়। যে সকল স্বেচ্ছাসেবক দরজায় পিকেটিং করিতেছিল, তাহাদের গ্রেপ্তার ও গুরুতররূপে প্রহার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয় এবং সব কয়জনেরই সাজা হয়; অপরাপর ব্যক্তিকে গভীর রাত্রে ১০ মাইল দূরবর্তী ভাইটগড়

নামক স্থানে লইয়া গিয়া আটক রাখা হয় এবং অবশেষে তাহারা ছাড়া পায়। আটক অবস্থায় তাহাদের প্রায় অনাহারেই কাটাইতে হয়।

সরকারী অফিস বিশেষতঃ আদালত সমূহ বর্জনের জন্য কাঁথি বাজার এবং জেলার স্থায়ী দোকানদারগণ ব্যতীত একজন বিক্রেতাকেও কাঁথি বাজারে দেখা গেল না। স্থায়ী দোকানীরাও সাময়িকভাবে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মালপত্র আনা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রায় তিন সপ্তাহকাল সহর জনশূন্য হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষ ভারতরক্ষা বিধানবলে কয়েকজন স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আটক করে এবং জনসাধারণ বাধ্য হইয়া মফঃস্বল হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়নের চেষ্টা করিতে থাকে। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের মোক্তারগণ নূতন মামলা গ্রহণ না করিবার সঙ্কল্প করেন।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌকীদার ও দফাদারদের পদত্যাগ করাইয়া গ্রাম ও থানা সমূহের মধ্যে যোগসূত্র নষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয়। এই জাতীয় প্রচারের ফলে বহু চৌকীদার স্বেচ্ছায় চাকুরীতে ইস্তাফা দেয়। উহাদের কয়েকজনকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এবং অন্যান্য চৌকীদারগণ থানায় আর হাজির দেওয়া বন্ধ করে।

মহিষাগোটে গুলী চালনা

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পিছাবনীতে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বিরাট জনতা পুলিশকে ঘেরাও করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তি দাবী করে। জনতা দেখিয়া পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক-দিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

ইহার পর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে পুলিশ হানা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং কাঁথি সহর হইতে চার মাইল দূরে সরিষাবেড়িয়ায় (মহিষাগোট) কাঁথি রামনগর জেলা বোর্ডের রাস্তা কাটিয়া দেওয়া হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহকুমা হাকিম এবং মহকুমা পুলিশ অফিসার একদল সশস্ত্র কনষ্টেবল সহ ঐ অঞ্চলে যান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কতকগুলি বাড়ী ঘেরাও করিয়া গ্রামবাসীদিগকে রাস্তার কাটা অংশ ভরাট করিয়া দিতে বাধ্য করেন। পুলিশ দেখিয়া কতকগুলি বাড়ীর মহিলাগণ দরজা বন্ধ করিয়া দেন। বাড়ীতে কোন পুরুষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। রাস্তা মেরামতীর জন্য গ্রামবাসীদিগকে বলপূর্বক নিয়োগের প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা যে স্থানে রাস্তা কাটা হইয়াছিল, সেই স্থানে সমবেত হয়। জেলা বোর্ডের ওভারশিয়ার কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হওয়ায় এবং তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেওয়ায় জনতা চলিয়া যাইতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হয় এবং প্রায় এক ফার্লং দূরে মহিষাগোটের পুকুরের পাড়ের গাছতলায় তাহারা আশ্রয় নেয়।

ইতিমধ্যে মহকুমা সহর হইতে আরও পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ আসিয়া পৌঁছিলে সশস্ত্র বাহিনীসহ মহকুমা হাকিম ঐ স্থান হইতে লোকদের নিকট গিয়া তাহাদের কাহারও সহিত আলাপ করিতে যান। জনতার মধ্যে হইতে কয়েক ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহকুমা হাকিমের দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালনা আরম্ভ হয়। ইহাতে জনগণের পিছু হাটিয়া যায়, লাঠি চালনার পর পুলিশ তাহাদের উপর ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে। প্রত্যুত্তরে জনতাও ইষ্টক ছুড়িতে থাকে। পুলিশ তখন ৩৫ বার গুলী চালনা করে। লাঠি ও গুলী চালনার ফলে প্রায় ২৪ জন লোক আহত হয়; আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পিপাসার্ত্ত হইয়া কেহ কেহ জল চায়। একটি বালক আহত ব্যক্তিগণকে জল দিতে অগ্রসর হইতে গেলে, তাহাকে সঙ্গীন উঁচাইয়া আক্রমণ করা হয়।

পুলিশ মহিষাগোট পুকুর পার হইতে তিনজন আহত ব্যক্তিকে পা

ধরিয়া টানিয়া যেখানে রাস্তা কাটা হইয়াছিল, তথায় লইয়া আসে। তথায় একখানি মোটর ট্রাক অপেক্ষা করিতেছিল। আহত ব্যক্তিগণকে ট্রাকে করিয়া কাঁথি সহরে লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে আহত দুই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি হাসপাতালে মারা যায়।

কাঁথি সহরে তিনজন বেসরকারী চিকিৎসক ঘটনাস্থলে গমন করিয়া আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পরদিন সকালে গুরুতররূপে আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং অন্যান্যকে গোপনে চিকিৎসা করা হয়। আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে হাসপাতালে একজন মারা যায়; ইহার ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় জন।

২০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে মহকুমা হাকিম সমর সেন এবং মহকুমা পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বাহিনী ভগবানপুর থানার এলাকাধীন গোপীনাথপুর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা দেয়। তাহারা ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রহার ও গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে লইয়া যাইতে থাকে। ধানতলায় আনুমানিক ১০ হাজার লোকের একটি জনতা পুলিশের নিকট স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তি দাবী করে। ইহাতে পুলিশ ক্রুদ্ধ হইয়া জনতার উপর লাঠি চালনা করে; কিন্তু জনতা বারংবার তাহাদের মুক্তি দাবী করায় ১১ জন বাদে সকল স্বেচ্ছাসেবককে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। উক্ত ১১ জনকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু হাজার হাজার লোকের জনতা পুলিশকে অনুসরণ করিয়া থানা পর্য্যন্ত যায় এবং মহকুমা হাকিম তাহাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলে এবং কংগ্রেসের সম্পাদক তাহাদের অনুরোধে জনতা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু মহকুমা হাকিম স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন না করায় বিক্ষুব্ধ জনতা মহকুমা হাকিমের মোটরলঞ্চ ও নৌকা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

কংগ্রেসভবন ভস্মীভূত

পুলিশ কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়, নিঃ ভাঃ কাটুনী সঙ্ঘের কাঁথি শাখা এবং কাঁথি শিল্প ভাণ্ডার সমেত একটি দোকান তল্লাসী করে কিন্তু ২০শে সেপ্টেম্বর তাহারা নিঃ ভাঃ কাটুনি সঙ্ঘের (কাঁথি শাখা) খদ্দরসমেত বহু মালপত্র নষ্ট করে এবং কংগ্রেস অফিসের সমুদয় কাগজ ও জিনিষপত্র আটক করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া অফিস বন্ধ করিয়া দেয়। সেচ্ছাসেবকরা দরজা ভাঙ্গিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ পুনরায় অফিস বন্ধ করিয়া দেয়। অতঃপর স্বেচ্ছাসেবকরা আবার উহার দরজা ভাঙ্গে এবং ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই অবস্থান করে। ইহার পর কংগ্রেস অফিস অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয় এবং উক্ত গৃহের মালিক শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে'কে গ্রেপ্তার করা হয়।

কাঁথি বাজার বন্ধ হইয়া যাইবার পর ২৪শে সেপ্টেম্বার গভীর রাত্রে মহকুমা হাকিম ও পুলিশ সাহেব সশস্ত্র কনেষ্টবলসহ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দিন্দা, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানা ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মাইতি এবং শ্রীযুক্ত ধরণীধর দিন্দা এম, এ, বি, এল-এর বাড়ী ঘেরাও করিয়া উহাতে প্রবেশ করে এবং তাঁহাদের দুগ্ধবতী গাভী লইয়া যায়। পুলিশ ভারতরক্ষা বিধানের ৭৫ এ ধারা বলে শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার মাইতি, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যনাথ শাসমল, মুন্সী মহীউদ্দিন ও অন্যান্যের বাড়ী হইতেও খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়।

২৭শে সেপ্টেম্বরে ৩৬ জন সশস্ত্র পুলিশ কাঁথি থানার এলাকাধীন চন্দনপুর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং হাত পা বাঁধিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী পুকুরে ফেলিয়া দেয়। অতঃপর পুলিশদল রামনগর থানার এলাকাধীন বেলবুনীর দিকে

চলিয়া যায় এবং তথাকার বালুর ঢিপির উপর অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা দিয়া ঘুমন্ত সেচ্ছাসেবকদের প্রহার করে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর শিবিরের সমুদয় জিনিষপত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অতঃপর পুলিশদল গ্রামে প্রবেশ করিলে এক জনতার সম্মুখীন হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা গুলীবর্ষণ করে। ইহার ফলে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। এবং ১৪ জন আহত হয়। পুলিশদল গ্রাম হইতে আসিবার পর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলে আর এক জনতার সম্মুখীন হয়; জনতা ছত্রভঙ্গের উদ্দেশ্যে আবার তাহারা গুলীবর্ষণ করে। এখানেও দুইজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং বহুব্যক্তি আহত হয়। বেলবনির গুলীবর্ষণে মোট ১০ জন ব্যক্তি নিহত হয়। আহত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ষাট জন। প্রথম তিনজন নিহত ব্যক্তির শব এবং তিনজন আহতকে লইয়া পুলিশ প্রস্থান করে, কিন্তু শেষের দুইটি শব রাখিয়া যায়। অতঃপর কয়েকজন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

১৯শে সেপ্টেম্বর পটাশপুর থানা আক্রান্ত হইলে থানা অফিসার পলাইয়া যান, ও বিপ্লবী জনতা কনষ্টেবলদের নিরস্ত্র করে। প্রথমে তাহাদিগকে বন্দী করা হয়, থানার সমস্ত জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

থানার সমস্ত কাগজপত্র ও আসবাবপত্র পোড়াইয়া ফেলা হয়। থানা ঘরের যে অংশ খড়ের তাহা পুড়িয়া যায়, যে অংশ পাকা তাহারও ক্ষতি হয়।

বিক্ষুব্ধ জনতা পটাশপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের সমস্ত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে। ঋণসালিশী বোর্ড, ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং আটটি পঞ্চায়েতী ইউনিয়নের সমস্ত কাগজপত্র তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে।

এইসব বিপ্লবী জনতা পটাশপুর ও মঙ্গলামারো আবগারী দোকানের আফিংএর হিসাব ও আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে এবং আরগোল, আমগাছিয়া, গোকুলপুর এবং গোপালপুর ডাকবাংলোর সমস্ত আসবাবপত্র ও গৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

তৎপর দফাদার ও চৌকিদারদের পোষাক পোড়াইয়া ফেলা হয়। এগ্রা-বজকুল ও লতাত-জংকা রাস্তায় ২০টি পাকা পয়ঃপ্রণালী নষ্ট করা হয়। জনৈক খাসমহাল তহশীলদারের কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হয়। ডাক বিভাগের একজন ওভারসিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া পরের দিন ছাড়িয়া দেয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর খেজুরী থানা জনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহারা থানা অফিসার ও তিন জন কনষ্টেবলকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করে এবং থানা, সাব রেজিষ্ট্রী অফিস ঋণসালিশী বোর্ড, ৩টি ইউনিয়ন বোর্ড, ৫টি পঞ্চায়েতী ইউনিয়নের সমস্ত কাগজপত্র ও হেনরিয়া খাসমহাল অফিসের সমস্ত কাগজপত্র ও টাকাকড়ি, নোট প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলে।

বিপ্লবীগণ খাসমহালের সাব ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করিয়া তিন দিন পরে ছাড়িয়া দেয়। বন্দীকালে তাঁহাকে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং ছাড়িয়া দিবার সময়ে যাইবার ভাড়া ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি দেওয়া হয়। পাটের অফিসের সমস্ত কাগজপত্রও পোড়াইয়া ফেলা হয়। খাসমহালের আট জন তহশীলদারের গৃহ হইতে সমস্ত কাগজপত্র, চেক এবং রসুলপুর, কামরকা ও বীর বন্দরের ডাক বাংলো পোড়াইয়া ধ্বংস করা হয়।

এই সমস্ত বিপ্লবীগণ হেনরিয়া, হলুদবাড়ী, কলাগাছিয়া, অজয়, জংকা এবং খেজুরী পোষ্ট অফিসের সমস্ত পোষ্ট কার্ড, খাম ও টিকিট প্রভৃতি পোড়াইয়া দিয়া থানার মধ্যস্থিত সমস্ত টেলিগ্রাম পোষ্টগুলি তুলিয়া লয়।

জনতা কালীনগরের টোল অফিস এবং সাব-ওভারসিয়ারের অফিসটি ধ্বংশ করে। কলাগাছিয়ার স্কুল, সাব-ইনস্পেক্টরের অফিস ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টরের অফিসটিও নষ্ট করিয়া ইহার সমস্ত জিনিষপত্র পোড়াইয়া ফেলা হয়।

বিক্ষুব্ধ জনগণ তিনটি কাঠের পুল ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং লতাত-জংকা ও কালীনগর এবং ঠাকুর নগরের মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তার ২০টি স্থান কাটিয়া ফেলে যাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যদের আগমনে বাধা সৃষ্টি হয়।

দুইটি আবগারী দোকানের সমস্ত আফিং, কাগজপত্র ও আসবাবপত্র নষ্ট করা হয়। পলবনিয়া পুল পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং চাঁদবনিয়া পুলটিও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এরাঞ্চী ও তল্লায় খেয়া নৌকা নষ্ট করা হয়, চিন্দুর দনিয়ায় খেয়া নৌকা কংগ্রেসের অধীনে দেওয়া হয়।

থানা, থানা অফিসার ও কনষ্টেবলদিগের গৃহ পোড়াইয়া ফেলা হয়। খাসমহাল অফিসের পাকা অংশ ধ্বংস করা হয় ও খড়ের অংশও ভস্মীভূত হয়।

মিলিটারী, পুলিশ ও গবর্ণমেণ্ট অফিসারদের জন্য কেরোসিন ও ডাল চিনি, ঘি ও আটা প্রভৃতি সহ তিনখানি নৌকা পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে দুইখানি নৌকায় সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রায় ৫০০০৲ টাকা মূল্যের কেরোসিন ও বাকি একখানি নৌকায় খগেন্দ্রনাথ শাসমল প্রায় ৯০০০৲ টাকার ডাল, চিনি, ঘি প্রভৃতি আনাইতেছিলেন।

ইহার পর খেজুরী ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসারকে ১১ জন কনষ্টেবল সহ এখানে পাঠানো হয়। কিন্তু রসুলপুর নদী পার হইবা মাত্রই তাহাদিগকে বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার করেন এবং কংগ্রেস বন্দিশালায় ১০ দিন আটক রাখার পর তাহাদিগকে সুন্দরবনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং

মুক্তিদানের পর পাথেয় দেওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আটক ১১টি বন্দুক পরে গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর প্রায় ২০০০০ লোক ভগবানপুর থানা আক্রমণ করে। থানা কাঁটা তার দিয়া ঘেরা এবং সুরক্ষিত ছিল। শোভাযাত্রা থানার গেটের নিকট পৌছিলেই কাঁথি খাসমহালের ম্যানেজার ও ভগবানপুর থানার দ্বিতীয় অফিসার শোভাযাত্রার উপরে গুলী করিতে আরম্ভ করেন। ফলে ১৩ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৯০ জন আহত হন।

শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দাস গুলীর পরেও থানা-হাজতে ৩০ ঘণ্টা জীবিত ছিলেন। তাহার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই, তাহাকে কোন খাদ্য বা জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী যখন একজন আহত ব্যক্তিকে জল দিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গুলী করা হয়। তিনি পুকুরের মধ্যে পড়িয়া যান। তাঁহার মৃতদেহ পরদিনও পুকুরে ভাসিতেছিল।

বীর বন্দর হাঁসপাতালে পরেশচন্দ্র জানা এবং ১৬ই অক্টোবর থানা হাজতে ধীরেন্দ্রনাথ দলপতের মৃত্যু সহ এই ঘটনায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১লা অক্টোবর তোতানালা, ভীমেশ্বরী, কাজলাগড়, মুগবেড়িয়া ও বড়বেড়িয়া পোষ্ট অফিস, একটি টেলিগ্রাফ অফিস, কাজলাগড় সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, পাট অফিস, পল্লী পুনরুন্নয়ন অফিস পোড়াইয়া দেওয়া হয়। প্রায় সকল চৌকিদার ও দফাদারদের পোষাক ও ২টি মেলব্যাগ পুড়াইয়া দেওয়া হয়। আটটি খেয়া নৌকা পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং একটি পাকা পুল নষ্ট করা হয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ২টি স্থানে কাটিয়া দেওয়া হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর কাঁথি-বেলকা রাস্তায় বরনালগেরিয়ার একস্থানে

কাটিয়া দেওয়া হয় এবং বাধা সৃষ্টির জন্য গাছ কাটিয়া রাস্তার উপরে ফেলিয়া রাখা হয়। প্রায় দুই মাইল স্থানের টেলিগ্রাফ তার কাটিয়া ফেলা হয় এবং পোষ্ট তুলিয়া লওয়া হয়। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা পুলিশ অফিসারগণ পুলিশ দলসহ তাজপুর গ্রামে যান।

পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করিয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করে। ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মাইতি, ৬৫ বৎসরের নবকৃষ্ণ মাইতি, ৯৬ বৎসরের বৃদ্ধ বসন্তকুমার মাইতি ও এই পরিবারের দুই জন যুবক বিশেষভাবে প্রহৃত হন।

পুলিশ দল রসুলপুর ও বরনালগেরিয়া গ্রামের অধিবাসীদিগকেও প্রহার করে। বাদলপুর ঋণসালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত কেনারাম অধিকারী ও কয়েকজন দোকানদারকেও প্রহার করা হয়। রাস্তার কাটা স্থান সমূহে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাদিগকে সাধারণ কুলীর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া রাস্তা মেরামত করাইয়া লওয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মাইতি, বসন্ত কুমার মাইতি ও নবকুমার মাইতি প্রভৃতি তাজপুরের ১৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কাঁথি সাব-জেল হাজতে তাঁহাদের বহুদিন আটক রাখা হয়। শ্রীকৃষ্ণ মাইতির দালান বাড়ী পেট্রোল সাহায্যে ভস্মীভূত হয়।

বসুদেবপুর, বলিঘাই, পাঁশরোল, চোরপলিয়া ও বইতা বাজার পোষ্ট অফিসের কাগজপত্র নষ্ট করা হয়। বাসুদেবপুর ও চোরপলিয়া ঋণসালিশী বোর্ডের কাগজপত্রেও ভস্মীভূত হয়। বসুদেবপুর, তাজপুর, বাথুয়ারী, চোরপলিয়া, পানিপারুল, ঝোরথান ও ঝরদা ইউনিয়ন বোর্ডের কাগজগত্র এবং এরান্দা ও ডুবদা পঞ্চায়েতী ইউনিয়নের কাগজপত্র নষ্ট করা হয়। ইহা ভিন্ন ৬৩ জন চৌকিদার ও ছয় জন দফাদারের পোষাকও পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং খাসমহল তহশীলদার শ্রীনিবাস

মহাপাত্রের কাগজপত্রে অগ্নি সংযোগ করা হয়। পাঁশরোল, পানিপারুল ও বেহতায় আফিংএর দোকানও ধ্বংশ করা হয়।

২৭শে আগষ্ট হইতে ২৯শে আগষ্টের মধ্যে কাঁথি-নগর এবং কাঁথি-রসুলপুর রাস্তার কয়েক স্থান কাটিয়া ফেলা হয় এবং কাঁথি-রসুলপুর রাস্তার উপর একটি কাঠের পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সাতমাইল, ভৈতগড়, কালীনগর, সুসুনিয়া, কালুয়া, রসুলপুর এবং পেটোয়াতে খেয়া নৌকা পোড়াইয়া দেওয়ার ফলে কাঁথি হইতে ভগবানপুর, খেজুরী ও এগ্রা যাইবার পথ বন্ধ হয়।

বাসুনিয়া ঋণশালিশী বোর্ডের সমস্ত কাগজপত্র এবং ভৈতগড়ের ডাক বাংলো, টোল অফিস ও ওভারসিয়ার অফিসের সমস্ত আসবাবপত্র নষ্ট করা হয়। সাত নং পঞ্চায়েতী ইউনিয়নের দলিলসমূহ এবং ২, ৯, ১১, ১৭, ১৯ ও ২০নং ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার ও দফাদারদের পোষাক লইয়া বিপ্লবীগণ বহ্ন্যুৎসব করেন।

ভৈতগড়ে গুলি

৩০শে সেপ্টম্বর অপরাহ্ণে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস ডি ও সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে ছাত্র ও অন্যান্য লোকদিগকে একখানি লরীতে ইট বোঝাই করিতে ও ঠেলিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করেন। ইট বোঝাই লরী মরিসদা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হয়। যেখানে রাস্তা কাটা হইয়াছিল, তাহা মেরামত করিবার সরঞ্জাম ও গ্রামবাসীগণকে জোর করিয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পথে আরও কয়েকজন লোককে জোর করিয়া লরীতে উঠাইয়া লওয়া হয়। রাস্তা মেরামত করিতে করিতে সন্ধ্যা হইলে উক্ত কার্য্যস্থলে অভিনব উপায়ে আলোর ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে পুলিশ নবগঠিত মরিসদা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল গৃহে আগুন লাগাইয়া চতুর্দ্দিক

আলোকিত করে। পুলিশ চলিয়া গেলে রাত্রিতে লোকজন আসিয়া ইটগুলি আবার সরাইয়া ফেলে।

পরদিন একদল সৈন্স উক্ত স্থানে গিয়া ২৫টি গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, তাহারা ব্রজমোহন জানা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। তাহার পর রাস্তা মেরামত করিয়া তাহারা ভৈতগড় অভিমুখে চলিয়া যায়। পথে নচিন্দা বাজারে বহু দোকানের জিনিষপত্র তাহারা নষ্ট করে।

সৈন্সগণ ভৈতগড় মোটর ষ্টেসনে জনগণের উপর গুলী চালনা করিবার ফলে দুইজন গ্রামবাসী নিহত হয়। একজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়, অন্স আহত ব্যক্তিটি মুমূর্ষু অবস্থায় যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত সেই সময়ে একজন ব্রিটিশ সৈন্স তাহার গলদেশে লাথি মারায় তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাঁথি ফিরিবার পথে সৈন্সগণ নচিন্দা বাজারে ১৫ জন গ্রামবাসী ও দোকানীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

ইহাতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া নচিন্দা ডাকঘর ও অন্স একটি ডাকঘর পোড়াইয়া ফেলে। কাঁথি থানার মহিষাগোটের নিকটে রঘুনাথপুরে, চাউলখোলা, দেপাল ও সাগরোবয় ডাকঘরের মেলব্যাগ জোর করিয়া ছিনাইয়া লয়।

ইহাতে জেলা কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া সমগ্র মহকুমায় অবর্ণনীয় অত্যাচার আরম্ভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত মহকুমাতেই সামরিক শাসন চলিতেছিল। ১৯৪২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে কাঁথি-বেলদা রোডে সম্পূর্ণভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হয়। বাহির হইতে কাঁথি যাইবার ইহাই একমাত্র রাস্তা। মহকুমা হাকিম মুদ্রিত নোটীশ দ্বারা জানাইয়া দেন যে, সাত মাইলের মধ্যে কেহ রাস্তা, খেয়াঘাট বা টেলিগ্রামের লাইনে ক্ষতি করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করা হইবে। এই

আদেশ সত্ত্বেও উত্তেজিত জনতা ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতিয়া ওঠে। মহকুমা হাকিম ভারতরক্ষা আইনের ৫৩ ধারা মতে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন যে, সমগ্র মহকুমায় সরকারী কর্ম্মচারী, জেলাবোর্ড কর্ম্মচারী, খেয়াঘাটের ইজারাদার ও এম বি ডাক্তারগণ ব্যতীত কেহ রাত্রি ৮টার পর হইতে ভোর ৪টার পূর্ব্বে ঘরের বাহির হইতে পারিবে না। একস্থানে চার জনের বেশী জনতা, লাঠি ও লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বহন এবং ধর্ম্মোৎসব ব্যতীত শঙ্খধ্বনি করাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কাঁথি বাস সিণ্ডিকেট এবং কালীনগর ও রামনগর বাস এসোসিয়েশনের সমুদয় বাস আটক করেন; ইহার ফলে ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে মহকুমার সমুদয় বাস সার্ভিস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। চিঠির থলিয়াবাহী ডাকগাড়ীই কাঁথি হইতে কাঁথি রোড ষ্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকে; এবং একমাত্র সরকারী চাকুরিয়া ছাড়া অপর কোন লোককে ঐ বাসে যাতায়াত নিষদ্ধ হয়। সরকারী চাকুরিয়া ও স্থানীয় অফিসারদের অল্পসংখ্যাক যে সব বে-সরকারী বন্ধু ঐ বাসে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইত, তাহাদের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর কড়াকড়ি করা হয়; এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১লা অক্টোবর কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ সরোজকুমার মাইতিকে খদ্দর পরিধানের অজুহাতে ডাক গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না। জন-সাধারণকে কাঁথি রোড ষ্টেশন হইতে কাঁথি পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত; এই উভয় স্থানের মধ্যে ৩৬ মাইল ব্যবধান ছিল। শুধু তাহাই নহে জনগণকে মহকুমার সর্ব্বত্র হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

মহকুমার সমস্ত ডাকঘরে কঠোর সেন্সর প্রথার প্রচলন হয়; পোষ্টকার্ড বা খামে লেখা কোন কিছুই পরীক্ষা না করিয়া ছাড়া হইত না।

১৯১৬ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী বাংলা সরকার নিম্নোক্ত সমিতিসমূহ বে-আইনী ঘোষণা করেন, যথা—(১) কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি; (২) কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়; (৩) ভগবানপুর থানা কংগ্রেস কমিটি (৪) পটাশপুর থানা কংগ্রেস কমিটি; (৫) এগরা থানা কংগ্রেস কমিটি (৬) পাণিপারুল কংগ্রেস কমিটি; (৭) হিজুল তরুণ সঙ্ঘ ও অন্যান্য আরও সমিতি।

১লা অক্টোবর হইতে আনুমানিক পাঁচশত সৈন্য মহকুমার সর্বত্র মোতায়েন করা হয়; ১২টি বিভিন্ন শিবিরে উহাদের রাখা হয়, যথা—কাঁথি, জুনপুট, পিছাবনী, রসুলপুর, রামনগড়; দীঘা, বোঘা, ভগবানপুর থানা, এগরা থানা, মঙ্গলামারো, প্রতাপদীঘি এবং রসুলপুরের একটি লঞ্চ ও একটি নৌকায়। ঐ সব সৈন্য উলঙ্গ হইয়া স্নান করিত এবং ঐ অবস্থায় গ্রামের মহিলাদের প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত করিত।

প্রতিদিন বিমানসমূহ মহকুমার সর্বত্র টহল দিয়া ফিরিত। ২রা অক্টোবর ফুলেশ্বর গ্রামের নিকট একটি বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ে; ঐ ধ্বংশ-প্রাপ্ত বিমানের মধ্যে জনৈক মার্কিণ বিমানচালক ছিল; গ্রামবাসীগণ ক্ষিপ্ত জনতার হাত হইতে উক্ত বিমান চালকের জীবন রক্ষা করেন।

২রা অক্টোবর পটাশপুর থানা ভস্মীভূত হইবার পর, মহকুমা হাকিম, পুলিশ সাহেব, সার্কেল অফিসার এবং একদল সৈন্য ও সশস্ত্র কনষ্টেবল সহ থানার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য তথায় যায় এবং পথিমধ্যে খড়গ্রামে তাহারা আনুমানিক আট হাজার লোকের এক জনতার সম্মুখীন হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলী চালাইবার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়।

তেপারপাড়ায় গুলী বর্ষণ

৮ই অক্টোবর মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও সৈন্য

পটাশপুরে থানার এলাকাধীন তেপারপাড়ায় পৌছে এবং তেপারপাড়ার বাধে কিছু লোক সমবেত হইতে দেখিয়া মহকুমা হাকিমের আদেশে টমিগান হইতে গুলী চালনা করা হয়, ফলে ঘৃণধর সাঁতারা নামক জনৈক সেচ্ছাসেবক নিহত ও নয় জন গ্রামবাসী আহত হয়।

১৩ই অক্টোবর একদল সৈন্য ও পুলিশ গ্রামবাসীদের ঘরে আগুন দিবার উদ্দেশ্যে এগ্‌রা থানার এলাকাধীন আলিনগিরি গ্রামে প্রবেশ করে। একটি পুকুরের ধারে কয়েকজন গ্রামবাসী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা সেনাদের নিকট হইতে পোয়া মাইল দূরে ছিল। সেনাদল গ্রামবাসীগণকে দেখিবামাত্র তাহাদের উপর গুলী চালায়, ইহাতে তিনজন গ্রামবাসীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সৈন্যদল ও পুলিশ বালিয়া-গোবিন্দপুর গ্রামে হানা দিয়া জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্বিচারে গুলী চালায়। হরেকৃষ্ণ বেরা নামক জনৈক ব্যক্তি বাঁধের পাশে আত্মরক্ষার্থ লুকাইয়া ছিল; সৈন্যগণ তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং অপর দুই ব্যক্তি গুলী বর্ষণের ফলে আহত হয়।

মহিষাগোট ও বেলবনী গুলী বর্ষণে নিহত দুই ব্যক্তির শব ময়না তদন্তের পর তাহাদের আত্মীয়দের হাতে সমর্পণ না করিয়া তিন চার দিন শবব্যচ্ছেদাগারে রাখা হয়। অতঃপর গভীর রাত্রে স্থানীয় ভদ্রলোকদের হস্তে মৃতদেহগুলি সমর্পণ করা হয় এবং উহা শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

মহকুমাবাসীদের ভীতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে জেলা কর্তৃপক্ষ লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ নীতি নির্বিচারে অনুসরণ করিতে থাকেন। শুধু যে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরই এই ঘৃণ্য নীতি প্রয়োগ হইতে থাকে তাহাই নহে, অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে নিরীহ

গ্রামবাসীগণের গৃহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে থাকে। স্বাধীনতা প্রয়াসী কাঁথীবাসীদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও স্বাধীনতার স্পৃহা খর্ব করিবার জন্য সরকার যে সমস্ত নীচ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে একপ্রকার বিরল।

প্রত্যেক স্থানের শিবিরে অবস্থিত সেনাদের তিনচার দলে ভাগ করা হয়; এবং এই সমস্ত দলে কয়েকজন অসামরিক ও পুলিশ কর্মচারী রাখা হইত। তাহারা বিভিন্ন দিকে যাত্রা করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত এবং কংগ্রেস সেবীদের গৃহ অগ্নিসংযোগ করিয়া উহা ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থান করিত। লোকজন যাহাতে অগ্নি নিবাপিত করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে বিমানসমূহ নীচু দিয়া টহল দিত। এগরা থানার এলাকাধীন উদ্ধবপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগকালে পুলিশ গুলী চালায়; ইহাতে গুণধর ভুইঞা নামক এক ব্যক্তি আহত হয়। এগরা থানার এলাকাধীন তাজপুর গ্রামের শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ মাইতির কোঠা বাড়ীতে পেট্রল সহযোগে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তাঁহার ২০ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। সরকারী কর্ম্মচারীগণ বিভিন্ন গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গোলাজাত বহু শত মণ ধান পোড়াইয়া ফেলা হয়। ১২ই অক্টোবর কাঁথি থানার এলাকাধীন বড়চুনপাড়া গ্রামের শ্রীকাঙ্গালচাঁদ গিরির গৃহ ভস্মীভূত হইবার ফলে তাঁহার তিন শত মণ ধানও পুড়িয়া যায়। শ্রীযুত গিরি কাঁথির মহকুমা সত্যাগ্রহ কমিটির সভাপতি।

যখনই কোন পুলিশ দল কোন দিকে যাত্রা করিত, তখনই সে অঞ্চলের নরনারী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ধানক্ষেতে লুকাইয়া থাকিত এবং পুলিশ গ্রাম ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করিত। যদি কোন পুলিশ দল বেলা ১১টার মধ্যে গ্রামে পৌছিত, তাহা হইলে জনসাধারণ

ভাত ও কলার পাতা লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিত এবং ধানক্ষেতের বাঁধ অথবা পুকুরের পাড়ে বসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিত।

পুলিশ রাস্তায় যাহাকে দেখিত, তাহাকেই প্রহার করিত এবং তাহাদের নিকট স্বেচ্ছাসেবকদের নাম বা তাহাদের শিবিরের সন্ধান করিত। অলঙ্কারপত্র, টাকাকড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার স্থান জানিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ গ্রামবাসিদের নির্ম্মমভাবে মার-পিঠ চালাইত।

হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ৭৬৬টি বাড়ী পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চার শত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পুলিশ ও সৈন্যের লুঠতরাজ

বাড়ী তল্লাসী ও অগ্নিসংযোগকালে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিতিতে নগদ টাকাকড়ি গহনাপত্র ও অন্যবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি ব্যাপকভাবে পুলিশ ও সৈন্যরা লুঠতরাজ করিয়াছে।

নিম্নে ইহার কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল যথা—(১) পুলিশ দায়ুদপুরের শ্রীহরিনারায়ণ মাইতির নগদ পাঁচ শত টাকা এবং শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের অংশীদারদের নিকট হইতে নগদ পাঁচ শত টাকা লুণ্ঠন করে; (২) জনৈক শ্বেতাঙ্গ সৈন্য এগরা থানার এলাকাধীন রাসুদেবপুরের শ্রীঝটু চরণ বারিকের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করার সময় নিজের বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়, (৩) খেজুরী থানার এলাকাধীন জঙ্গা গ্রামের শ্রীদিগম্বর দাসের বাড়ীতে মাটির নীচে লুক্কায়িত চার হাজার টাকা পুলিশ লুঠ করে। ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির ষোল হাজার টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি লুন্ঠিত ও বিনষ্ট হয়।

৯ই অক্টোবর প্রত্যুষে জনৈক স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে ত্রিশ জন শ্বেতাঙ্গ সৈন্স অজয় গ্রামের জমিদার ও হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বেরার গৃহ তল্লাসী করে; তাহারা পাঁচ শত টাকা মূল্যের জিনিষপত্র নষ্ট করে এবং কিছু সোণার গহনাপত্র ও নগদ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। সৈন্সরা তাহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বেরাকে অজয় গ্রামে লইয়া গিয়া অজয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করিতে বাধ্য করে। পুলিশ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেরাকে গ্রেপ্তার করিয়া খেজুরী থানায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্স বন্দুক দেখাইয়া ভীতি প্রদর্শন করে।

৮ই অক্টোবর কাঁথি থানায় শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার শী এবং কানাই দীঘির শ্রীরাধারঞ্জন দাসের বাড়ীতে পুলিশ অগ্নি সংযোগ করে। উক্ত গৃহে অগ্নি সংযোগের পূর্ব্বে তাহাদের বাড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং একটি লরীযোগে তাঁহাদের বাড়ী হইতে কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার ও পাঁচ বস্তা সূতা কাঁথিতে প্রেরিত হয়। পুলিশ দল দণ্ড-পুরুলিয়া গ্রামের কালীনগর বাজারে অবস্থিত গৃহগুলিতে অগ্নি সংযোগ করে। শ্রীযুত রাধারঞ্জন দাসের গৃহের সহিত এক হাজার মণ ধানও পুড়িয়া যায়।

ফিরিবার পথে পুলিশ দলের জনৈক অফিসার ক্লান্ত হইয়া ডাঃ দাসের ঔষধালয় হইতে জলপান করিয়া সুস্থ হইয়া শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভুইঞাকে বেদম প্রহার করে এবং বুটের গুতায় তাঁহাকে নিকটবর্তী ধানক্ষেতে ফেলিয়া দেয়। তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন; সৌভাগ্যের বিষয় দীর্ঘকাল পরে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

পুলিশ জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপস্থিতিতে এগরা থানার এলাকাভুক্ত তাজপুর গ্রামের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মাইতি ও তাহার আত্মীয়দের

গৃহ লুঠ করে। বলিঘাই গ্রামের শ্রীপদ্মলোচন গিরির বাড়ী পূর্ব্বেই লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। ইহাতে তাঁহার মোট পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ-পত্র নষ্ট হইয়া যায়। নগদ আড়াই শত টাকা, পনর তোলা স্বর্ণালঙ্কার এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের সহিত পাঁচ শত মণ ধান ভস্মীভূত ও দোকান লুণ্ঠিত হয়।

নারীর উপর অত্যাচার

কাঁথি থানার এলাকাধীন আদমবর গ্রামের শ্রীমধুসূদন জানার বাড়ী লুণ্ঠনকালে পরিবারভুক্ত একটি মহিলাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার অলঙ্কার খুলিয়া লইবার পর তাঁহাকে পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে উক্ত মহিলার অবস্থা বিশেষ সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে।

ভগাবানপুর থানায় পুরুলবড় গ্রামের রাধাগোবিন্দ মাইতির বাড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং পুলিশ দশ তোলা সোণা ও তিন শত টাকা মূল্যের অন্যান্য জিনিষপত্র লইয়া যায়। কয়েকজন মুসলমানকে এই লুণ্ঠন কার্য্যের জন্য প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল।

বর্ত্তান গ্রামের বরেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ী লুঠ করিবার কালে পুলিশ তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতা ভীমেশ্বর দাসকে বন্দুক দেখাইয়া ভীতি প্রদর্শন করে এবং তাঁহাকে এক শত টাকা দিতে বাধ্য করে। কিশোরপুরের জমিদার শ্রীশ্রীমন্তকুমার পাত্রের বাড়ী হইতে বন্দুক লইয়া যাইবার সময় পুলিশ জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেড় শত টাকা লয়।

কিশোরপুর হইতে থানায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুলিশ রামনাথ বেরা নামক জনৈক গরীব জেলের বাড়ীতে ঢুকিয়া গিয়া তাহার কাঠের বাক্সে রক্ষিত ৩৭৲ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

ইহা ছাড়া ৫০ হইতে ১৫০ জন পুলিশ ও সৈন্য চাউল, ডাল, তরিতর-কারী, ছাগল, হাঁস, মুরগী, মাছ প্রভৃতি ভগবানপুরের থানার চতুষ্পার্শ্বে

অবস্থিত বাড়ী ও দোকান হইতে লুঠ করিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত।

খেজুরী থানার এলাকাধীন শিলিবাড়ীতে থানা ও অন্যান্য সরকারী ভবন ভস্মীভূত হইবার পর জনৈক স্পেশ্যাল অফিসারকে পাঠান হয়; ঐ ব্যক্তি শ্রীরামহরি মণ্ডলের বাড়ী হইতে ব্যাঙ্কের বই, চেক এবং ৫০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে এরূপ একটি রসিদ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তাহাদের প্রতিবেশীদিগকে সনাক্তকরণ, তাহাদের বাড়ীতে লুঠতরাজ এবং অগ্নিসংযোগে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য উৎসাহিত করেন। প্রকাশ, সরকারের সহায়তা করার জন্য মুসলমানদিগকে ঘুষ দেওয়া হয় এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা বাধ্য করা হয়। মুসলমানদিগকে এই আশ্বাসও দেওয়া হয় যে, সরকার সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদিগকে সকলপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। তাদের বাড়ীর উপর অর্ধচন্দ্র পতাকা রাখিয়া উহা চিহ্নিত করার জন্যও তাহাদিগকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়।

খেজুরী এবং পাঠানপুর থানার এলাকায় মুসলমানগণ তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের বাড়ীতে লুঠতরাজ চালায়। স্থানীয় কর্মচারিগণ যে ইহাতে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়তভাবে জানা গিয়াছে।

কাঁথি থানার এলাকাধীন মারিসদা, নাচিন্দা, ভাইটগড় এবং কানাইদীঘি গ্রামের অধীবাসীদের উপর ১০ হাজার টাকা, ভগবানপুর থানার এলাকাধীন গোপীনাথপুর, ১৫ হাজার টাকা এবং মির্জাপুর গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়। এই জরিমানা হইতে মুসলমান এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে রেহাই

দেওয়া হয়। তবে ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের জন্য এই জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই।

কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি মডেল ইনষ্টিটিউসন, কলাগেছিয়া হাই স্কুল এবং অন্যান্য কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বহু মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে এখনও পর্য্যন্ত পুনরায় অনুমোদনের ব্যবস্থা হয় নাই। এই মহকুমার একমাত্র কলেজ, প্রভাতকুমার কলেজের অনুমোদন এখনও র্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এই কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সমগ্র কাঁথী অঞ্চলে পুলিশদের অতর্কিতে হানা, খানাতল্লাসী, লুঠতরাজ এবং স্ত্রীলোকগণের উপর পাশবিক অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল। একজন সরকারী কর্ম্মচারী দিনের বেলায় সাহায্য বিতরণ করিতেন। রাত্রিতে সৈন্যদলের সাহায্যে তাঁহাকে জনসাধারণের গৃহে হানা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইত। একদিন এই সরকারী কর্ম্মচারীটি কাঁথির মহকুমা হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দিনের বেলায় সাহায্য বিতরণ করিয়া তাঁহার পক্ষে রাত্রিতে এইভাবে জনসাধারণের বাড়ীতে হানা দেওয়া উচিত কি না। ইহার উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল যে, তাঁহাকে দুইটি কাজই করিতে হইবে; দিনের বেলায় সাহায্য বিতরণ এবং রাত্রিতে জনসাধারণের গৃহে হানা দেওয়ার মধ্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই।

যে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্য বিতরণ করিত; রাজনৈতিক পরিস্থিতির অজুহাতে তাহাদের কার্য্যে এতই বাধা দেওয়া হইত যে, আর্ত্তদের নিকট সাহায্য বিতরণে যথেষ্ট বিলম্ব হইত। সরকারের এই বাধাদান নীতিতে বহু লোককে আদৌ সাহায্য করা সম্ভব হইত না।

সাহায্য বিতরণের কার্যে বাধাদানের ফলে সময়ের অপচয় হইত, সময় মত সাহায্য করিতে না পারায় কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে, সঠিকভাবে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবার পর জনসাধারণের নামে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সমর পরিষদগুলি কিছুদিন পর্য্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিল। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আংশিকভাবে কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অচল হইবার পর কোন না কোন নামে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পটাসপুরে এবং খেজুরী থানায় প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত সরকারী কর্তৃত্বের কোনরূপ চিহ্ন ছিল না এবং এই দুইটি থানায় পূর্ণ কর্তৃত্বশীল জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রামনগর এবং ভগবানপুর থানাতেও জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ জাতীয় গবর্নমেণ্টের কর্তা হিসাবে একজন সভাপতি অথবা ডিক্টের থাকিতেন। সভাপতি অথবা ডিরেক্টরের অধীন একটি মন্ত্রণা পরিষদ অথবা মন্ত্রিসভা থাকিত। মন্ত্রীদের অধীনে স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দপ্তর থাকিত।

জাতীয় গবর্নমেণ্টের শাসনাধীন সমগ্র অঞ্চল (থানা) কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত এলাকায় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চায়েৎ বোর্ড শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেন। বিচার কার্য্য পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবাধ্য লোকদিগকে নিয়ন্ত্রণের কার্য্যে জাতীয় গভর্নমেণ্টের সহায়তা করিবার জন্য সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। অপরাধীদিগকে এবং যাহারা "শত্রু" এবং গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পর জেলে রাখা হইত।

জাতীয় গভর্নমেণ্টের কার্য্য পরিচালনার জন্য কর ধার্য্য করা হইত এবং জরিমানা হিসাবে যে টাকা আদায় হইত তদ্দ্বারা দুর্গত জনসাধারণকে সাহায্য করা হইত।

এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য সমগ্র দেশ জুড়িয়া যে সংগ্রাম চলিতেছে সেই সংগ্রাম সফল হইলে যে বিরাট ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—এই সমস্ত স্থানীয় জাতীয় গভর্নমেণ্টকে সেই গণতন্ত্রের অঙ্গীভূত করা হইবে।

গভর্নমেণ্ট পুনরায় নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নৃশংস-পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গভর্নমেণ্টের অনুচরগণ নির্ব্বিচারে অগ্নিসংযোগ ও স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই সমস্ত অমানুষিক নির্যাতন এবং বন্যা ও ঝটিকাজনিত দুর্গতিবশতঃ নিরস্ত্র জনসাধারণ বেশীদিন ধরিয়া এই সমস্ত অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। গ্রামের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদল মোতায়েন করা হয় এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রচ্ছন্ন সামরিক আইনের শাসন চলিতে থাকে। গভর্নমেণ্টের এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রমের ফলে জাতীয় গভর্নমেণ্টের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

পরিশিষ্ট

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে অক্টোবর মাসের ঝটিকার সময় পর্য্যন্ত ঘটনাপঞ্জী :—

৬ই আগষ্ট :—মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা।

১৪ই সেপ্টেম্বর :—মফঃস্বল হইতে আগত ১৪টি শোভাযাত্রা কাঁথি সহর প্রদক্ষিণ করে।

২০শে সেপ্টেম্বর :—গোপীনাথপুর ক্যাম্পে হানা দিয়া জনসাধারণ কর্তৃক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণকে মুক্তিদান। কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়েও নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের দোকানে পুলিশের হানা; শিল্প ভাণ্ডার লুণ্ঠিত। পুলিশ কর্তৃক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির অফিসে হানা এবং অফিস তালাবন্ধ।

২৪শে সেপ্টেম্বর :—স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং দুগ্ধবতী গাভী ছিনাইয়া লওয়া হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর :—চন্দনপুর ক্যাম্পে হানা। স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রহার করিয়া জলে ডুবানো হয়। বেলবনী ক্যাম্পে হানা ও গুলীবর্ষণ—গুলীবর্ষণের ফলে ১০ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত। সান্ধ্য আইন জারী—শঙ্খধ্বনি এবং চারিজনের অধিক লোকের একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ।

২৯শে সেপ্টেম্বর :—ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ। পটাসপুর ও খেজুরী থানা আক্রমণ করিয়া থানার অফিসার ও কনষ্টেবলদিগকে নিরস্ত্র করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। থানার বাড়ী-ঘর এবং কাগজপত্র ধ্বংস ও ভস্মীভূত করা হয়। ভগবানপুর থানাও আক্রমণ করা হয়। গুলীবর্ষণের ফলে ১৬ জন নিহত ও ৮৭ জন আহত। সাবরেজেষ্টারী আফিস, ডাকঘর, খাসমহল আফিস, ডাক-বাংলো, চুঙ্গীর আফিস, মাদক দ্রব্যের দোকান, ইউনিয়ন বোর্ডের আফিস, ঋণসালিশী বোর্ডের আফিস, জুট আফিস, সেতু, খেয়াঘাট প্রভৃতি ধ্বংস এবং ভস্মীভূত করা হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর :—পুলিশ কর্তৃক মাচিসদা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ। কালীনগর সড়ক মেরামত করিবার জন্য আলো জ্বালাইবার প্রয়োজন হওয়ায় পুলিশ এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে।

ডাকবাহী বাস ছাড়া মহকুমার সর্বত্র বাস চলাচল বন্ধ—অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিশেষ বাস চালাইবার ব্যবস্থা।

প্রভাতকুমার কলেজের মাসিক আড়াইশত টাকা সাহায্য বন্ধ। কয়েকটি থানায় সরকারী কর্তৃত্ব বিপর্যস্ত। পটাসপুর, খেজুরী, রামনগর এবং ভগবানপুর থানায় জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত।

১লা অক্টোবর :—ভগবানপুর থানায় ডাকঘর, সাবরেজেষ্টারী আফিস, পল্লী সংস্কার আফিস এবং ডাক-বাংলো প্রভৃতি ভস্মীভূত।

ভাইটগড়ে গুলীবর্ষণ :—২ জন নিহত এবং ১ জন আহত। মারিসদার ২৫ খানি বাড়ী ভস্মীভূত। চিঠিপত্র সেন্সর করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত। সমগ্র মহকুমায় প্রায় পাঁচশত সৈন্য মোতায়েন।

২রা অক্টোবর :—ফুলেশ্বরের নিকটে একখান টহলদার বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ে। পটাসপুর থানার অন্তর্গত খড়ে গুলীবর্ষণ—১ জন নিহত ও ১ জন আহত।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ

থানা, ডাকঘর প্রভৃতি যে সমস্ত সরকারী অফিস এবং অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস এবং ভস্মীভূত করা হয়, তাহার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—থানা—২টি, ডাকঘর—২৫টি, সাবরেজেষ্টারী অফিস—৩টি, খাস মহল অফিস—৪০টি, ইউনিয়ন বোর্ড এবং পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন অফিস—৪০টি, ঋণসালিশী বোর্ড, জুট অফিস, চুঙ্গী অফিস, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ওভারসিয়ার অফিস, খাসমহল অফিস—২৬টি, ডাক বাংলো—১২টি, মাদক দ্রব্যের দোকান—৭টি, সেতু—১৮টি, খেয়া নৌকা—১৭ খানি, সরকারী মালপত্রবাহী নৌকা—৩খানি।

খাসমহল সাব ম্যানেজার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কনষ্টেবল এবং সশস্ত্র পুলিশের লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খেজুরী থানায় সমস্ত টেলিগ্রাফের থাম এবং ভগবানপুর ও এগরা প্রভৃতি থানায় বহু টেলিগ্রাফের থাম অপসারিত করা হয়; এতদ্ব্যতীত বহু থানার টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়।

এগরা থানায় ৬৩ জন চৌকীদার ও ৮ জন দফাদারের উর্দি ভস্মীভূত করা হয়। ভগবানপুর ও এগরা থানায় বহু মেলব্যাগ নষ্ট করা হয়। নানাস্থানে রাস্তা কাটা হয়। ১৩টি বন্দুক হস্তগত করা হয়।

গুলীর আঘাতে নিহত ব্যক্তিগণ

১৪ই আগষ্ট হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত গুলী বর্ষণের ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিহত হয়

১১শে সেপ্টেম্বর মহিষগোটে গুলী চালনা করা হয়। নিহত ব্যক্তিগণের নাম :—(১) যামিনীকান্ত কামিলা—তেজপুর (থানা কাঁথি), (২) অনন্তকুমার পাত্র—পটপুকুরিয়া (থানা কাঁথি), (৩) চন্দ্রমোহন জানা—ঘোল (থানা কাঁথি), (৪) সর্বেশ্বর প্রমাণিক—দক্ষিণ শীতলা (রামনগর), (৫) শ্যামানন্দ দাস, (৬) কুঞ্জবিহারী সিট।

২২শে সেপ্টেম্বর বেলবণীতে গুলী চালনার ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিহত হয় :—

(১) ভজহরি রাউত—বেলবণী (থানা—রামনগর), (২) বংশীধর কর—কাদুয়া (থানা—রামনগর), (৩) রজনী ঘোষ—সেনাকালিয়া (রামনগর), (৪) হেমন্তকুমার দাস—কাদুয়া (রামনগর), (৫) চৈতন্যকুমার বেরা—মাধবপুর (রামনগর), (৬) বৈনাচরণ দাস মহাপাত্র—লালপুর (রামনগর), (৭) শিবপ্রসাদ, (৮) চন্দ্রমোহন দাস, (৯) সর্বেশ্বর প্রামাণিক, (১০) রামপ্রসাদ জানা।

১লা অক্টোবর ভাইটগড়ে গুলী বর্ষণের ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় নিহত হয় :—

(১) অমূল্য শাসমল—উকীল চক (থানা—কাঁথি), (২) সুধীরচন্দ্র মাইতি—বাসুদেব বেড়িয়া (কাঁথি)।

২৯শে অক্টোবর ভগবানপুরে গুলীবর্ষণের ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিহত হয়ঃ—(১) যুধিষ্ঠির জানা—বামন সিমুলিয়া (ভগবানপুর), (২) বিভূতিভূষণ দাস—বর্তন সিমুলিয়া (ভগবানপুর), (৩) জগন্নাথ পাত্র—মুনহাঁড়ি (ভগবানপুর), (৪) শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান—কুলবেড়িয়া (ভগবানপুর), (৫) হরিচরণ বেড়া—গুড়গ্রাম (ভগবানপুর), (৬) রামকান্ত দাস—কলা বেড়িয়া স্কুলের পণ্ডিত (ভগবানপুর), (৭) রঘুনাথ মণ্ডল—বেতুলিয়া চক—(ভগবানপুর), (৮) হরিপদ মাইতি—গুড়গ্রাম (ভগবানপুর), (৯) রঞ্জন মাইতি—খেজুরারি (ভগবানপুর), (১০) তারক জানা—বেন্দিয়া (ভগবানপুর), (১১) ভারতচন্দ্র সিংহ—লালুয়া গোপালচক (ভগবানপুর), (১২) জ্ঞানদা মাইতি—তাতানালা (ভগবানপুর), (১৩) পরেশচন্দ্র জানা—গোরবার (ভগবানপুর), (১৪) কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী বাসুদেবপুর (থানা এগরা), (১৫) ভূষণ সামন্ত—বাউদিয়া (থানা ময়না), (১৬) ধীরেন্দ্রনাথ দলপপ (গ্রামের নাম জানা যায় নাই ; থানা হাজতে মারা গিয়াছে)।

১৩ই অক্টোবর অলিনগিরিতে গুলীবর্ষণের ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় নিহত হয় :—(১) ভগীরথ রথ—অলিনগিরি (থানা এগরা), (২) মুরারি-মোহন বেরা—অনিলগিরি।

২রা অক্টোবর তারিখে গুলীবর্ষণের ফলে পটাসপুর থানার অন্তর্গত পিন্দ্রাই গ্রামের কেদারনাথ জানা নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়। ৮ই অক্টোবর তাপের পাড়ায় গুলীবর্ষণের ফলে পটাসপুর থানার অন্তর্গত অমরপুর গ্রামের গুণধর সাঁতরা নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়।

১৮ই অক্টোবর বালিয়া-গোবিন্দপুরে গুলীবর্ষণের ফলে পটাসপুর থানার অন্তর্গত চন্দনখালি গ্রামের হরেকৃষ্ণ বর নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়।

কলিকাতা

আগষ্ট বিপ্লবে দুর্ম্মদ রাজশক্তি কলিকাতার রাজপথে নগ্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে মেসিনগান সমন্বিত সাঁজোয়া গাড়ীতে বৃটিশ গোলন্দাজগণ নিরস্ত্র জনগণের সহিত যে অপূর্ব্ব সংগ্রাম করিয়াছে তাহা বৃটিশ বীরত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। বিশ্বের বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে তাহারা সশস্ত্র শত্রুর নিকট হইতে পশ্চাৎ অপসরণ করিলেও অনশনে অর্দ্ধাশনে মৃত্যুপথ যাত্রী নিরস্ত্র শিশু ও নারীদের হত্যা করিয়া বৃটিশ ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছে। সমগ্র মেদিনীপুর, এই গণ অভ্যুত্থানে বাত্যাহত ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়াও বিপ্লবের হোমানলে চরম আত্মাহুতি দিয়া যে ধ্বংশের তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিল ইতিহাস চিরকালের জন্ত তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিবে। . . .

কাঁথি ও তমলুকের অধিবাসীগণ ধ্বংশের প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যেও সৃজনী শক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা বিদেশী শাসন শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া নিজেদের শাসন শক্তিকে প্রতিষ্টিত করিয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশের অন্তান্ত স্থানের গণ বিপ্লব সাফল্যের বিজয় গৌরবে যদিও মণ্ডিত হয় নাই তথাপি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিরস্ত্র বিপ্লব বিদেশী রাজশক্তির মনে তীব্র ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

১০ই আগষ্ট বাংলা সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে বেআইনী ঘোষণা করেন। ১১ই ও ১২ই তারিখে কলিকাতার ছাত্রগণ স্কুল ও কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা করে।

১৩ই আগষ্ট তারিখের সংবাদপত্রে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল পার্লিয়ামেণ্টে বোম্বাইয়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন যে কলিকাতা তথা বাংলা দেশ এই নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও কংগ্রেসের প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ঐ দিন দ্বিপ্রহর হইতেই কলিকাতায় গণ-বিক্ষোভ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ পায়।

কলিকাতায় ছাত্রগণ ওয়েলিংটন পার্কে এক প্রতিবাদ সভায় পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে। ছাত্রগণ ট্রাম ও বাসের যাত্রীগণকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে হাঁটিয়া যাইতে অনুরোধ করে। পুলিশ ইহাতে বাধা দান করে। ক্রমশঃ পুলিশের সহিত জনতার সংঘর্ষ দেখা দেয়। জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া হ্যারিসন রোড ও মির্জ্জাপুর রোডের সংযোগস্থলে ও শঙ্কর ঘোষ লেন ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে তিনটি ট্রাম গাড়ী অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীমানী বাজারের নিকট পুলিশের সহিত জনগণের সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে সরকারী সশস্ত্র গুর্খা পুলিশ তুইবার গুলী চালনা করে। কলিকাতার রাজপথ বৈদ্যনাথ সেনের রক্তে সর্ব্বপ্রথম রঞ্জিত হয়। এই বীর যুবক ১৪ই আগষ্ট প্রাতঃকালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরাধীন ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। শ্রীমানী বাজারের প্রথম দিনের গুলী চালনার সংবাদ সরকারী স্বার্থে সাজাইয়া গুছাইয়া বাহির করা হয়। শ্রীমান বৈদ্যনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুর সঠিক কারণ সরকার পক্ষ চাপিয়া ফেলিতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। কোনও দায়িত্বশীল সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী সঠিক সংবাদ বার বার প্রকাশের অনুমতি চাহিয়াও ব্যর্থ হন।

১৪ই আগষ্ট কলিকাতায় গণআন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং সরকারী রুদ্রনীতিও তীব্রতর হয়। একমাত্র চৌরঙ্গী ও সাহেব

পাড়া ছাড়া কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলে আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশ সার্জ্জেণ্টগণ সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে গুলি চালনা করে। উপদ্রুত অঞ্চল এত বিস্তৃত ও বিপজ্জনক হয় যে হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। শুক্রবার পুলিশের গুলীতে ছয় জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়। লাঠির আঘাতে প্রায় ৬৫ জন ব্যক্তি জখম হয়। এক সাহেব পাড়া ছাড়া কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের দোকান পাট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে।

শুক্রবার প্রাতে নয় ঘটিকার সময় অপার চিৎপুর রোডে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সম্মুখে প্রথম বিক্ষোভ দেখা যায়। জনতা ট্রামের দড়ি কাটিয়া দিয়া ট্রাম অচল করিয়া দেয়। রাস্তার মধ্যে ডাষ্টবিন ও গরুর গাড়ী প্রভৃতি রাখিয়া পথ আটকাইয়া ফেলে। পুলিশ লাঠি চার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বেলা ১০টার সময় বিডন ষ্ট্রীটে পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া একটি জনতা ছত্রভঙ্গ করে।

দ্বিপ্রহরে বিডন স্কোয়ারের ভিতর বিপুল জনসমাগম হয় এবং তাহারা বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতে থাকে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িয়া জনতা ছত্র ভঙ্গ করে।

দ্বিপ্রহর ১২টার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অবস্থা বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করে। জনতা ট্রামের তার কাটিয়া দেয়, টুপি এবং নেকটাই টানিয়া পোড়াইতে থাকে। রাস্তার দুই ধারের পোষ্ট বক্স ভাঙ্গিয়া চিঠিপত্র নষ্ট করে এবং টেলিফোনের তার কাটিয়া রাস্তা বন্ধ করে। পুলিশ বেলা ১টা হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বহু জায়গায় লাঠি চালনা করে এবং বেলা দুইটা হইতে গুলী চালনা আরম্ভ হয়।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীমানী বাজারের নিকট সিটি কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান দিলীপকুমার ঘোষ পুলিশের বেপরোয়া গুলী চালনার ফলে নিহত হয়। সে তাহার ভগ্নীর বিবাহের জন্য বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল। গুলী চালনা আরম্ভ হইলে সে তাড়াতাড়ি ভূবন সরকার লেনে ঢুকিয়া পড়ে। একজন সার্জ্জেণ্ট তাহাকে তাড়া করিয়া তাহার বুকে গুলী করে; তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। নিহত দিলীপ কুমারের পিতা পুত্রের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া যখন আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন সত্য-নারায়ণ পার্ক হইতে একটি শোভাযাত্রা কলিকাতার বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিপরীত দিক হইতে একটি মিলিটারী লরী আসিয়া নির্ব্বিচারে গুলী বর্ষণ আরম্ভ করে। ফলে এক জন ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং দিলীপ কুমারের পিতা শ্রীযুত অমূল্য চরণ ঘোষ আহত হন। বিদ্যাসাগর কলেজের সম্মুখে দুইবার গুলী চালনার ফলে দুই জন নিহত এবং পাঁচ জন আহত হয়। বেঙ্গল টেলিফোনের কর্ম্মচারী শ্রীযুত পাল টেলিফোন লাইন মেরামত করার সময়ে মিলিটারী সৈনিকের গুলীতে নিহত হন। মাড়োয়ারী হাসপাতালের আর একজন কর্ম্মীও পুলিশের গুলীতে আহত হন। সেণ্ট্রাল এভেনিউ এবং বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে অপরাহ্ন পৌনে পাঁচটার সময় গুলী চালনার ফলে আট জন পথচারী আহত হন। গুলী চালনার অব্যবহিত পরেই চার জন রয়েল এয়ার ফোর্সের কর্ম্মচারী এবং এক জন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা উক্ত রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল। ক্রুদ্ধ জনতা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল ছুড়িবার ফলে তাহারা সকলেই আহত হয়।

অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় নিমতলা ঘাটের নিকট পুলিশের গুলী চালনার ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। বহুবাজার, ভবানীপুর এবং

আপার সার্কুলার রোডে ক্ষিপ্ত জনতা তিন খানি ট্রামে আগুন ধরাইয়া দেয়।

আপার সার্কুলার রোডে বিক্ষুব্ধ জনতা টেলিফোনের তার কটিয়া দেয় এবং ট্রাম সম্পূর্ণভাবে অচল করিয়া দেয়। পুলিশ এই রাস্তায় অপরাহ্ন চার ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত চার বার গুলী চালনা করে। ছিদাম মুদীর লেনে একটি বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পুলিশ তিন ভাইকে জখম করে। সাহিত্য পরিষদের সম্মুখে জনতা একটি বাস আক্রমন করিয়া কয়েকজন আরোহীকে নামাইয়া তাহাদের টুপি ও নেকটাই ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিডন ষ্ট্রীটে জনতা একটি মিলিটারী লরী পোড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যার সময় পুলিশ স্কটিশ চার্চ্চ স্কুলের নিকট পুনরায় গুলী চালাইবার ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সাহেবী পোষাক পরিহিত কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে জনতা আক্রমন করে. এবং তাহার টাই, টুপী এবং প্যাণ্ট ছিঁড়িয়া ফেলে। একজন সাংবাদিক উক্ত দিবসে আহত হন।

সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় সময় হাজরা রোডের মোড়ে পুলিশ কয়েকবার গুলী চালনা করে এবং চার জন ব্যক্তি আহত হয়। অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকায় সময় আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডে পুলিশ একটি অহিংস ও নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালনা করে। সাড়ে তিনটায় সময় জগুবাজারের সম্মুখে লাঠি চালনার ফলে এক ব্যক্তি আহত হন। মনোহর পুকুর রোড জনতা বিদেশী বস্ত্র, টুপী, এবং নেকটাই জমা করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে।

অপরাহ্নে হাওড়া টাউন হলে হাওড়া মিউনিসিপালটির কমিশনারদের এক বিশেষ সাধারণ সভা আরম্ভ হইলে শতাধিক যুবক সভাগৃহে ঢুকিয়া

সভা ভঙ্গের দাবী জানায়। সদস্যগণ সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখেন। কলিকাতা কর্পোরেশন সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন।

উক্ত দিবস বম্বে মেল, ডুন এক্সপ্রেস, দিল্লী এক্সপ্রেস এবং পার্শ্বেল এক্সপ্রেস হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়ে নাই। আপ পাঞ্জাব মেল ১৩ আগষ্ট অপরাহ্নে রওনা হইয়াছিল কিন্তু পর দিবস ঝাঝা হইয়া হাওড়ায় ফিরিয়া আসে।

১৫ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতা একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া মিলিটারী লরীসমূহ হইতে টমিগান ও ব্রেনগান দ্বারা সমস্ত দিন নির্ব্বিচারে গুলী চালনা করা হয়। সহরের অন্যান্য অংশেও মিলিটারী ও সার্জ্জেণ্টগণ সমানভাবেই গুলীচালনা করে। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীর ছাদ হইতে পুলিশ লরীর উপর ইট পড়ায় ঐ অঞ্চলের লোকজনদের উপর মার পিট করে। ঐ দিন রাত্রে হাতীবাগান বাজারে জনৈক বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর দোকানে সার্জ্জেণ্ট প্রবেশ করিয়া নানাভাবে তাহাদের লাঞ্ছিত করে ও অনেক জিনিষপত্র অপচয় করে। ঐ দিবস ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ১৬ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতার সর্ব্বত্র সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আন্দোলন লাগিয়াই ছিল। সহরের সর্ব্বত্র মিলিটারী ও সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিয়া বেড়ায়। কিছুক্ষণের জন্য মাত্র কয়েকটি স্থান ছাড়া সহর ও সহরতলীর সমস্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল। প্রাতে বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সন্নিকটে একডালিয়া রোডে বালিগঞ্জ সাব পোষ্টাফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আন্দোলনকারীরা পোষ্টাফিসের একটি জানালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং অগ্নিসংযোগ করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পোষ্টঅফিস ভবনের এক অংশ জ্বলিতে থাকে। দমকল আসিয়া তাড়াতাড়ি অগ্নি নির্ব্বাপিত

করে। উক্ত ঘটনার পর হইতে বালিগঞ্জে মিলিটারী, সার্জ্জেণ্ট ও পুলিশের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় তাহারা রাইফেল ও রিভালবার উচাইয়া সমস্ত রাস্তায় টহল দিতে থাকে।

অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকায় মিলিটারী ও সার্জ্জেণ্ট কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর হোষ্টেলের সম্মুখে লাঠি ও গুলী চালায়। সার্জ্জেণ্টগণ উক্ত অঞ্চলের ছোট ছোট রাস্তার ভিতরে গিয়াও নিরীহ পথচারীদের গুলী করে।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে তারাচাঁদ লাহার এভেনিউএর নিকট জনতা বাগবাজার গামী একখানি ট্রাম বেলা একটার সময় আগুণ ধরাইয়া দেয়। উক্ত অঞ্চলের আন্দোলনকারীরা রাস্তার নানাস্থানে ডাষ্টবিন প্রভৃতি দিয়া রাস্তা বন্ধ করে এবং কয়েকস্থানের টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয়।

গুর্খা সৈন্যদল ও সার্জ্জেণ্ট উদ্যত রাইফেল ও রিভালবার হস্তে দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের একটি বাড়ীতে শ্রীযুত ভদ্রেশ্বর দত্ত নামক ৬৫ বৎসরের এক ব্যক্তিকে ও স্থানীয় যুবক ও বালকদের ডাষ্টবিন প্রভৃতি দিয়া রাস্তায় আন্দোলনকারীরা যে বেড়া দিয়াছিল তাহা সরাইতে বাধ্য করে।

সন্ধ্যার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও হাতিবাগান বাজারের নিকট মিলিটারী ও পুলিশ বাহিনী বেয়নেট ও লাঠি চালনা করিয়া কয়েকজন পথচারীকে আক্রমণ করে। কয়েকজন পথিক নিকটস্থ একটি খাবারের দোকানে প্রবেশ করে। পুলিশ উক্ত খাবারের দোকানে ঢুকিয়া জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া দেয়। রবিবার প্রত্যুষ হইতে নানা স্থানে খানা-তল্লাস চলে এবং ২০ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে।

সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই কয়দিনের হতাহতের সঠিক বিবরণ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়। অবশেষে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের নির্দ্দেশক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ

কোয়ালিশন দলের সেক্রেটারী সৈয়দ বদরুদ্দোজা এক আবেদন প্রচার করিয়া পুলিশের গুলীতে হতাহতের বিস্তৃত বিবরণ প্রধান মন্ত্রীর নিকট পাঠাইবার অনুরোধ করেন।

১৯৪৩ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায় যে কলিকাতায় পুলিশের গুলীতে ২০ জন নিহত ও ১৫২ জন আহত হয়। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে বলেন যে "পুলিশ কোন কোন ক্ষেত্রে হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছে।"

সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দৈনিক সংবাদপত্র "ভারত" ১৪ই এবং ১৫ই আগষ্টের বিভিন্ন হাসপাতালে যে হতাহতের বিবরণ বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে—৯২ জন (১৩ই আগষ্ট ৭৫ এবং ১৪ই আগষ্ট ১৭) মৃত্যু সংখ্যা জানা যায় নাই। ক্যাম্বেল হাসপাতাল—৪৫ জন (১৩ই আগষ্ট ৩২, ১৪ই আগষ্ট ১৩) ১৩ই আগষ্ট ১৫ জন ও ১৪ই তারিখে ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে দুই দিনে ২২ জন ভর্ত্তি হয় তন্মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হয়। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—২৮ জন (১৩ই আগষ্ট ২৩ জন ও ১৪ই আগষ্ট ৫ জন) ইহাদের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অন্যান্য হাসপাতালের বিবরণ জানা যায় নাই। যাঁহারা গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাদের তালিকা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রের মালিকগণের এক সভায় ১৮ই আগষ্ট হইতে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সংবাদপত্র বন্ধ রাখার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতার বিপ্লবের কাহিনী ও পুলিশের অমানুষিক অনাচারের বিশদ বিবরণ একমাত্র 'ভারত'

পত্রিকাতেই বাহির হয়। এই অপরাধে ভারত পত্রিকা অফিসে পুলিশ খানাতল্লাসীর সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করে। পুলিশ খানাতল্লাসীর পর উক্ত পত্রিকার কার্য্যালয় শীল মোহর করিয়া যায়। 'ভারত' পত্রিকার এই চরম আত্মাহুতি সংবাদপত্র জগতে অপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য সংবাদ পত্রের মালিকগণ কয়েকদিন বন্ধ রাখার পর সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতে থাকেন। পরে সরকারী সেন্সর নীতি স্বীকার করিয়াই পক্ষাধিক কাল পরে কলিকাতার এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি সংবাদ পত্র ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্র সমূহের নৈতিক অবনতি ও বিপন্নতার সুযোগ লইয়া বিদেশী শাসকবর্গ কংগ্রেসকে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে গুণ্ডাগিরির অপবাদ দিয়া নানারূপ সচিত্র বিজ্ঞাপন বাহির করে। যদি সমস্ত সংবাদ পত্রের কর্তৃপক্ষ সমস্বরে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলে বিদেশী আমলাতন্ত্র কিছুতেই এই প্রকার অপমানকর ব্যবস্থা তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইতে সাহস করিতেন না। "ভারত" পত্রিকা পুলিশ কর্তৃক শীলমোহর করিবার পর এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক শ্রীযুত মাখনলাল সেন আত্মগোপন করেন। বহুদিন আত্মগোপনের পর তিনি গ্রেপ্তার হন। শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়া একদিন পরে মুক্ত দেওয়া হয়।

বালুরঘাট [দিনাজপুর]

কলিকাতার গণ-বিক্ষোভের পরে বালুরঘাটের অধিবাসীগণ আগষ্ট বিপ্লবের হোমানলে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আত্মাহুতি দেয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের অপরাধে বালুরঘাটে নিরস্ত্র অধিবাসীগণ বিদেশী সরকারের নিকট চরম শাস্তি শান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তাহাদের উন্নত শির অবনত করে নাই। বালুর ঘাটের বিপ্লবী জনগণ ২৪ ঘণ্টার জন্য উক্ত অঞ্চল হইতে বিদেশী শাসন লুপ্ত করিয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জ্জী যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে নিম্নোক্ত অভিযোগ সমূহ আছে:—গুলীচালনা, নরনারীর উপর অত্যাচার, হয়রানি করা, বাড়ীতে খানাতল্লাস ও হানা, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন, সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা, এবং অন্যান্য দমন মূলক কার্য্য।

জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যপকভাবে গ্রেপ্তার, গুলীচালনা, পিটুনী পুলিশ ব্যবস্থা ও পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

উক্ত রিপোর্টে জানা যায় যে, গুলীর আঘাতে চারি ব্যক্তি নিহত হয় এবং বালুরঘাট সহরের একাংশের হিন্দুদের উপর মোট ৭৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

গোলযোগ সম্পর্কে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ৩৭ জন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং আরও প্রায় ১০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। পুলিশ বালুরঘাটের কংগ্রেস ভবন অধিকার করিয়া তালাবদ্ধ করিয়া রাখে।

গোলযোগের সময় জনতা সরকারী ও আধা সরকারী অফিস সমূহে হানা দিয়া সাব রেজেষ্ট্রী অফিস ভস্মীভূত করে; স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের অফিস এবং কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভবনও পোড়াইয়া দেয়। টেলিগ্রাফের তাঁর কাটিয়া টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি বিকল করিয়া দেয়।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর যে গণ-আন্দলন আরম্ভ হয়, স্থানীয় কংগ্রেসের প্রথম সত্যাগ্রহী শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আন্দোলন আরম্ভ করার দিন ধার্য্য হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে পল্লী কংগ্রেস নেতৃবর্গের নেতৃত্বাধীনে গ্রামবাসীদের ১০০টির-অধিক দল মহকুমা হইতে অগ্রসর হইয়া বালুরঘাট সহর হইতে তিন মাইল দূরে আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম তীরে সমবেত হয়। কোন কোন দল ৩০ মাইল দূর হইতে আসিয়া এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী বালুরঘাট সহরের একদল কংগ্রেস কর্ম্মীসহ তাহাদিগকে ঘাটে সম্বর্দ্ধনা জানান ঐ স্থানে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহারা নদী পার হইয়া নদীর পূর্ব্ব তীরে সমবেত হন এবং কংগ্রেস পতাকা অভিবাদন করেন। এখানে শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জী এক বক্তৃতার পর জনতা শোভাযাত্রা করিয়া "বন্দেমাতরম", "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে সহরের দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের অভিযানকালে আরও গ্রামবাসী আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেয়। বেলা ৮টার সময় শোভাযাত্রা সহরে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে হরতাল ঘোষণা করিয়া ব্যাপকভাবে মুদ্রিত পুস্তিকা বিলি করা হয়। শোভাযাত্রা ট্রেজারীর নিকটে পৌছিলে শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জ্জী অন্যান্য বিষয়ের সহিত ট্রেজারীর প্রহরী ও কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরী ছাড়িয়া জনসাধারণের পক্ষে-

যোগদান করার আবেদন জানাইয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। ইহার পর সাবট্রেজারী অফিস, ডাকঘর, দেওয়ানী আদালত ভবন, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ভবন, বি, এ, রেলওয়ের আউট এজেন্সী অফিস, জুট ইন্সপেক্টারের অফিস, গাঁজার দোকান, এগ্রিকালচারাল ডেমনষ্ট্রেটারের অফিস ও গুদাম, এসিষ্ট্যাণ্ট জুট ইন্সেপেক্টারের অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস প্রভৃতির উপর আক্রমণ চলিতে থাকে।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় সমগ্র শোভাযাত্রা সহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ব্যক্তিগতভাবে কোনও হিংসামূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, দেওয়ানী আদালতের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা ও এগ্রিকালচারেল ডেমনেষ্ট্রেটারের অফিসের গুদাম হইতে খাদ্যশস্য লুণ্ঠন কতিপয় দুর্ব্বৃত্তের কার্য্য।

শোভাযাত্রাকারিগণ পুনরায় ডঙ্গির হাটের নদী পার হয়। ঐস্থানে গভর্নমেণ্টের মজুত ধান অধিকার করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের মধ্যে বিলি করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন, কিন্তু তিনি কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া ফিরিয়া যান। সিমুলতলীতেও জনতা কিছু ধান অধিকার করিয়া লইয়া যায়।

তপন থানা আক্রমণ করা হইবে বলিয়া এক সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি সশস্ত্রবাহিনী সহ ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে তথায় উপস্থিত হন; ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ গ্রামবাসী জেলার বাহিরে ধান প্রেরণে বাধা দিবার জন্য তেলীঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র বাহিনী সহ ঐ স্থানে গিয়া জনতার উপর গুলী চালান। ঐ স্থানে পাঁচ ছয় জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা ঐ স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিল।

২২শে সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রে একটি পুলিশ দল শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ মণ্ডলের গৃহে হানা দেয়। তিনি নাকি বালুরঘাটের ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। যে ঘরে শ্রীযুক্ত মণ্ডল তাঁহার স্ত্রী ও শিশুদের লইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, পুলিশ দল সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করে এবং শ্রীযুক্ত মণ্ডলের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে। অবিলম্বে একদল গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মণ্ডলের গৃহের নিকটে সমবেত হয়। পুলিশ দল গুলী চালায়। কিন্তু তাহারা বিপ্লবী জনতার নিকট শীঘ্রই পরাজিত হয়। তাহাদের মধ্যে ছয় সাত জনকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। পরদিন তাহারা মুক্তিলাভের জন্য অনুরোধ জানায়। শ্রীযুক্ত মণ্ডল গ্রামবাসীদের একটি সভা আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকটে বিচারার্থ বিষয়টি উপস্থাপিত করেন। এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, পুলিশ যদি কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে এবং তাহারা সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এতদনুসারে পুলিশদলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে জলযোগ করিতে দেওয়া হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর পুলিশ ইন্সপেক্টার ও পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার একটি সশস্ত্র বাহিনীসহ একদল পুলিশকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে মোরাডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হন। ঐ পুলিশদলকে নাকি লোকেরা আটক করিয়া রাখিয়াছিল। পথে পরিলাঘাটে তাঁহারা দুইজন রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করে। ঐ স্থানে একদল গ্রামবাসী সমবেত হইয়া তাহাদের মুক্তির জন্য দাবী জানাইলে পুলিশ গুলি চালায়। ইহাতে নানাস্থান হইতে আরও অনেক লোক আসিয়া সমবেত হয় এবং সাওতালগণ তীর ধনুক লইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করে। ইহাতে পুলিশ ধৃত দুই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় এবং জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ,

পুলিশ ৬৬টি কার্ত্তুজ ও ১০টি গুলী ব্যবহার করে। তিন ব্যক্তি গুলীর আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। উহাদের মধ্যে একজন ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, উপরে যে সকল ঘটনার কথা বলা হইল, তাহাতে ইহাই প্রমানিত হয় যে, সহর ও গ্রাম উভয় স্থানের কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সম্পূর্ণ অহিংস ছিলেন। পারিলাহাট গ্রামে পুলিশ যখন গুলী চালায় সেই সময় কংগ্রেস নেতৃবর্গ গুলীর আঘাত, শান্ত ভাবে মাটিতে বসিয়া গ্রহণ করেন। মাধাকুড়ির অধর মণ্ডল নামক ৭০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম গুলীর আঘাতে আহত হন। ১৭ই সেপ্টেম্বর সকালে সামরিক পুলিশ কয়েকটি গৃহ খানাতল্লাস করার অজুহাতে আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সমগ্র মহকুমায় সভা ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হয়।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জ্জিকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তাহার বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া রাখা হয় এবং পরে তাহার জিনিষ পত্র নিলামে বিক্রয় করা হয়। মোরাডাঙ্গা গ্রামের ৪২টি গৃহ ধ্বংস করা হয়।

ঢাকা

কলিকাতায় রক্ত স্নানের পর বাংলার অন্যান্য স্থানেও রক্তাক্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা দেয়। প্রত্যেক স্থানেই ঘটনাবলীর সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বত্র বিদেশী শাসকবর্গের শাসন যন্ত্র বিকল করিবার জন্য রেলওয়ে, থানা, পোষ্টাফিস ধ্বংস করিবার প্রবল আগ্রহ দেখা যায়।

১৯৪২ সালের ১০ই আগষ্ট স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘটী ছাত্রগণ তাহাদের স্কুল বা কলেজ হইতে অন্য কলেজে যাইবার সময় পথিমধ্যে পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। সমস্ত সহরের অধিবাসীগণও সহরে হরতাল প্রতিপালন করিতেছিলেন। ১১ই আগষ্ট তারিখে পুলিশ ধর্ম্মঘটী ছাত্রদের ইডেন গার্লস কলেজের সম্মুখে লাঠি চার্জ্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করে।

১৩ই আগষ্ট তারিখে ক্ষিপ্ত জনতা ঢাকা মুনসেফ কোর্ট আক্রমণ করে এবং কোর্টের দলিল পত্রাদিতে আগুন ধরাইয়া দেয়, ফলে পুলিশ আক্রমণকারী জনতার উপর গুলী বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে কয়েকজন আহত ও একজন নিহত হয়। ঢাকা সহরের টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের তারও কর্ত্তিত হয়। ঢাকার জনগনের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ হরতাল ও আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৪ই আগষ্ট একদল যুবক নবাবপুর, উয়ারী, টিকাটুলী লক্ষ্মী বাজার ফরাসগঞ্জ এবং ওয়ালটার রোডে অবস্থিত পোষ্টাফিস সমূহের যাবতীয়

নথীপত্র ভস্মীভূত করে। ঢাকেশ্বরীও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের কর্ম্মীগণ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে ধর্ম্মঘট করে।

১৫ই আগষ্ট তারিখে কয়েকস্থলে বিপ্লবী জনগণের সহিত পুলিশ ও সৈন্যগণের সংঘর্ষ বাধে। বিদেশী সৈনিকগণ নিরস্ত্র জনতার উপর প্রবলভাবে গুলীবর্ষণ করে; ফলে ঘটনাস্থলে পাঁচ জন নিহত হয় ও বহু আহত হয়। ক্ষিপ্ত জনতা নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যস্থিত গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করে। রেলওয়ে লাইনসমূহ ধ্বংশ করার ফলে উক্ত অঞ্চলে ট্রেণ চলাচল সম্পূর্নরূপে বন্ধ হয়। গভর্ণমেণ্ট টিচার্স ট্রেণিং কলেজ, ইম্পীরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর আফিস আক্রমণ করিয়া জনগণ বহু রেকর্ড ধ্বংশ করে।

১৭ই আগষ্ট ফরাসগঞ্জ থানার অন্তর্গত দুইটি গ্রামের পোষ্টাফিস অগ্নি সংযোগে ধ্বংশ করা হয়।

১৮ই আগষ্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিপ্লবী জনতা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুড়াপাড়া পোষ্টাফিস আক্রান্ত হয় এবং মোহনগঞ্জ ও দেওভোগের আবগারী বিভাগের দোকানসমূহ লুন্ঠিত হয়। লুন্ঠিত দ্রব্যগুলি নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

মুন্সীগঞ্জ সব ডিভিসনে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ও পোষ্ট ধ্বংশ করা হয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জের অধিবাসীগণ তালতলা ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করিলে, পুলিশ নিরস্ত্র জনতার প্রতি গুলী বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে তিন জন নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর গ্রামবাসীগণ নবাবগঞ্জ থানা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পুলিশ গ্রামবাসীগণের উপর গুলী চালনা করে, ফলে ১ জন নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়।

ফরিদপুর

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে ফরিদপুর যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিবাদ ও আন্দোলন করিয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিবে।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও দমননীতি অস্বীকার করিয়া ছাত্রগণ হরতাল ও শোভাযাত্রা করে। বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায়। জনতা পোষ্টাফিস ও সরকারী ভবন সমূহ অগ্নি সংযোগে ধ্বংশ করে। সহরের এই আন্দোলন শীঘ্রই গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

৬ই সেপ্টেম্বর নিরস্ত্র জনতার এক প্রতিবাদ সভায় পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত রাধাগঞ্জে অবস্থিত সরকারী ভবন জ্বালাইয়া দেয়।

আন্দোলন যতই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হইতে লাগিল সরকারী চণ্ডনীতি ততই তীব্ররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর মাদরীপুরের বালক বালিকাদের এক শোভাযাত্রা পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করে। ৭ই সেপ্টেম্বর একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা চিকান্দী মুন্সেফ কোর্টের অগ্রসর হইতে থাকে তখন পুলিশ নির্ম্মমভাবে শোভা যাত্রীদের উপর লাঠি চালনা করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ঐ একই দিনে খাগড়া বাজারে ছাত্রদের এক শোভ-যাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে। নারিয়াতে অন্তরীণ শ্রমিক

নেতা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে সরকারী আদেশে গ্রেপ্তার করার সময় অবস্থা চরম সীমায় পৌছায়। গ্রাম ও গ্রামান্তর হইতে দলে দলে আসিয়া তাহারা নারিয়া গ্রামের চতুর্দিকে জমায়েৎ হয়। গ্রামবাসীগণ তাহাদের প্রিয় নেতাকে পুলিশ যাহাতে গ্রেপ্তার করিতে না পারে তজ্জন্য তাহারা প্রবলভাবে বাধা দান করে। গ্রামবাসীগণ সুরেশ বাবুর গৃহে দিনরাত পাহাড়া দিতে থাকে। অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে পুলিশের বন্দোবস্ত করে। পুলিশ সুরেশ বাবুকে গ্রেপ্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় জনতার উপর মুহুর্মুহু লাঠি চালনা করে। এই লাঠি চালনার ফলে বহুলোক আহত হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর বিক্ষুব্ধ জনতা মাদারীপুরের অন্তর্গত গোঁসাইএর হাট পোষ্টাফিসে অগ্নিসংযোগ করে। পালংএর সন্নিকটে গ্রামবাসীগণের একটি শোভাযাত্রা বাহির করিলে পুলিশ লাঠিচালনা করে।

সমগ্র ফরিদপুর সরকারী অত্যাচারে উত্তিষ্ঠ হইয়া ওঠে। ফলে জনতা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষের চরম রূপ গ্রহণ করে ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাঙ্গা গ্রামে। পুলিশ তাহার সমগ্র পশু শক্তি প্রয়োগ করিয়া এক উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে জনতা ক্রুদ্ধ হইয়া একজন পুলিশ সাব ইনস্পেক্টারকে হত্যা করে। আন্দোলনকারীগণের আক্রমণের ফলে দুই জন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ ইন্সপেক্টার হত্যার অব্যবহিত পরে সরকারী ব্যবস্থাপকগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে; সমগ্র ভাঙ্গার অধিবাসীগণের উপর দিয়া চরম অত্যাচারের স্রোত বহিতে থাকে। সরকারী সেন্সর ব্যবস্থার জন্য অধিক ঘটনা প্রকাশ না হইলেও যে সমস্ত অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্যগণ জ্ঞাত হন, তাহা যদি আংশিক সত্য ও হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে বর্ত্তমান জগতে যে জাতি আজ সভ্যতার

শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে মূলতঃ তাহাদের অন্তরে আজও পাশবিক হিংস্রতা গর্জ্জন করিতেছে। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হককে, স্থানীয় অবস্থা শান্ত করিবার জন্য এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য একদল বঙ্গীয় আইন সভার সভ্যদের ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন।

বরিশালঃ—বাংলার গৌরব অশ্বিনীকুমার দত্তের বরিশাল আগষ্ট আন্দোলনে পিছাইয়া পড়ে নাই। তাহারা বিদেশী সরকারের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

জাপানী আক্রমণে ভীত হইয়া বৃটিশ সরকার সর্ব্বপ্রথমে বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে বঞ্চনা নীতি অনুসরণ করে; এবং লক্ষ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। বরিশালের অধিবাসীগণ তাহাদের সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া তাহারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ফলে জনগণ পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হন। ছাত্র ও ছাত্রীগণ স্কুল ও কলেজ হইতে বাহির হইয়া আদালত, বার লাইব্রেরীতে পিকেটিং আরম্ভ করে। আন্দোলনকারীগণ আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাহাদের বিতাড়িত করে। ক্রুদ্ধ জনতা ষ্টীমার ষ্টেশন ও পোষ্টাফিস অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। আগষ্ট আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইলেও উৎসাহী কর্ম্মচারীগণের, অত্যাচারের স্রোত কমে নাই।

ময়মনসিংহঃ—ময়মনসিংহের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আগষ্ট আন্দোলনের প্রবাহ আসিয়া পৌঁছে। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ময়মনসিংহ সহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। ছাত্র ও ছাত্রীগণ স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শোভাযাত্রা করিয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ১৯শে আগষ্ট একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে।

সরকারী কর্ম্মচারীগণ ইহাতে কোন বাধা দান করে নাই। ৩১শে আগষ্ট জনতা ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস ট্যাক্সের অফিস প্রভৃতি আক্রমণ করে। উক্ত ঘটনার পর ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে সহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। ঐ দিবস মহিলা ছাত্রীদের এক শোভাযাত্রা মিলিটারীগণ বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করে। ১২ই সেপ্টেম্বর জনতা মুক্তাগাছা পোষ্টাফিসে অগ্নিসংযোগ করে।

ত্রিপুরাঃ—ত্রিপুরা জেলার সরকারী কর্ম্মচারীগণ জনগণের কোন প্রকার আন্দোলনের পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কথা চিন্তা করিয়া সক্রিয় হইয়া ওঠে। ১৩ই আগষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস আফিস খানা-তল্লাসী করার পর, বহু কংগ্রেস কর্ম্মীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়াই কুমিল্লার ছাত্রগণ অনির্দ্দিষ্ট কাল হরতাল ঘোষণা করে। ২৪শে আগষ্ট আন্দোলনকারীগণ কুমিল্লার ইনকাম ট্যাক্স আফিসের নথীপত্রে অগ্নি সংযোগে বহ্ন্যুৎসব করে। চাঁদপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করে। জনতা কুমিল্লার সন্নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া বহু ক্ষতি সাধন করে। বিক্ষুব্ধ জনতা একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করায় যানবাহনের চলাচল বিশেষভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়।

নদীয়াঃ—কুষ্টিয়ার ছাত্র-ছাত্রীগণই নদীয়া জেলাতে প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করে। রাণাঘাটের উত্তেজিত জনতা টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইন ধ্বংশ করে। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির সাতজন কমিশনার নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদকল্পে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। শ্যামনগর এবং তাহার নিকটস্থ গ্রামের পোষ্টাফিস সমূহ জনতা পোড়াইয়া দেয়। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে চারিটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী অগ্নিসংযোগে ভষ্মীভূত করা হয়। আন্দোলন ক্রমশঃ নদীয়া জেলার

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়। শান্তিপুর ফটকাবাড়ী ও রামপুরের পোষ্টাফিস সমূহ অগ্নিদগ্ধ হয়। জনতা বেলডাঙ্গা এবং আজিমগঞ্জের রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা বহরমপুরের জেলা জজের আদালত আক্রমণ করে। আক্রমণকারীগণ ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয়। বহরমপুর এবং খাগড়ার একটি শোভাযাত্রা পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করে! মুড়াগাছা রেলওয়ে ষ্টেশনে জনতা অগ্নিসংযোগে ধ্বংশ করে।

সরকারী রুদ্রনীতি যতই চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষে আন্দোলন ততই পরিব্যাপ্ত হইতে হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে সৈন্যগণ বিমান হইতে জনগণকে মেসিনগান দ্বারা আক্রমণ করে।

১৯৪২ সালে ২রা অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বঙ্গীয় আইন সভায়, রাণাঘাটে বিমান হইতে মেসিনগান চালনার একটি ঘটনা বিবৃতি করিয়া বলেন যে কতকগুলি কুলী যখন রেলওয়ে লাইনে কাজ করিতেছিল তখন একটি টহলদারী বিমান, কুলীগণকে আন্দোলনকারী মনে করিয়া নির্ব্বিচারে মেসিনগান হইতে গুলী বর্ষন করে।

যশোহরে কোন আন্দোলন হইবার পূর্ব্বেই স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশে সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়। নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ছাত্রগণ সভা ও শোভাযাত্রা করায় পুলিশ বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করে। ২২শে সেপ্টেম্বর জনতা যশোহর রেলওয়ে ষ্টেশনের একটি ঘরের দলিল পত্রাদি ভস্মীভূত করে। ১৬ই আগষ্ট খুলনায় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রাতে সাড়ে দশটার সময় শোভাযাত্রীদের এক অংশ স্থানীয় আদালতে প্রবেশ করিয়া আদালতের দালান সমূহের ক্ষতি করিলে পুলিশ বলপ্রেয়োগে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে।

১১ই সেপ্টেম্বর বগুড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার এক শোভাযাত্রা কালেক্টরী ভবনে প্রবেশ করিয়া কাগজপত্রসমূহ লইয়া যায়। নরনারী নির্ব্বিশেষে এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। জনতা ভালুরপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বগী অগ্নিসংযোগে ধ্বংশ করে। শেরপুর ও চন্দ্রদেওনার মধ্যস্থিত টেলিগ্রাম লাইন ধ্বংশ করা হয়।

মালদহ জেলায় রতন থানার অন্তর্গত পোষ্টাফিস, আবগারী দোকান ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী আফিসসমূহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। জেলার বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ লাইনসমূহ ধ্বংশ করা হয়।

"ভারত ত্যাগ কর" এই প্রস্তাব কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর ভারতব্যাপী যে মহাবিপ্লবের সূচনা হয় তাহা বাংলা দেশের সুদূর পল্লীতে যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছিল তেমনি হিমালয়ের হিমশীতল দার্জ্জিলিং অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হইল। ৯ই সেপ্টেম্বর মহাদেব দেশাইএর মৃত্যু উপলক্ষে শিলিগুড়ীতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। স্থানীয় নরনারীগণের এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থানার নিকটবর্ত্তী হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে অস্বীকার করিলে পুলিশ নির্ব্বিচারে গুলী চালনা করে। ফলে ঘটনাস্থলে তিন ব্যক্তি নিহত হন এবং প্রায় ১২ জন আহত হন।

হাওড়া:—হাওড়ার অধিবাসীগণ কলিকাতার আদর্শেই তাহারা আন্দোলন পরিচালনা করেন। সহস্র সহস্র কারখানার কর্ম্মীগণ কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসে। ছাত্র ছাত্রীগণ স্কুল কলেজ যাওয়া বন্ধ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করে। বিক্ষুব্ধ জনতা কলিকাতার ন্যায় ট্রাম গাড়ীর উপর আক্রমণ চালায়; ফলে বিভিন্ন অঞ্চল সমূহে ট্রাম গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সহরের টেলিফোন, টেলিগ্রাফের তার এবং আলোর স্তম্ভগুলি আন্দোলনকারীগণ ধ্বংশ করে। ১৭ই

আগষ্ট জনতা টেলিগ্রাফের তার নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে আগষ্ট বেলিলিয়াস পার্কের নিকটে পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালনা করে। ৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রগণ একটি শোভাযাত্রা করিয়া আদালত প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ বলপ্রয়োগে জনতা ছত্রভঙ্গ করে। আন্দোলনকারীগণ হাওড়া আদালতের সম্মুখে পিকেটিং করে।

হুগলী ঃ—হুগলী অঞ্চলেও কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করে। এই জেলার চুঁচড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। চণ্ডীতলায় সরকারী কয়েকটি কুটীর জনতা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে।

আরামবাগ অঞ্চলে আন্দোলনকারীগণ, খাসমহল, ইউনিয়ন বোর্ড, পোষ্টাফিস প্রভৃতি অগ্নিদগ্ধ করে। কোন্নগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে টেলিগ্রাফ লাইন জনতা ধ্বংশ করে। স্থানে স্থানে পুলিশও জনতার সহিত সংঘর্ষ বাধে। একস্থানে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলী চালায়।

বৰ্দ্ধমান ঃ—ছাত্র সমাজ প্রধান অংশ গ্রহণ করায় আগষ্ট আন্দোলন বৰ্দ্ধমানে গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৭ই আগষ্ট সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শোভাযাত্রা বৰ্দ্ধমান কোর্টের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রীগণ কোর্ট ভবনের সম্মুখে পিকেটিং আরম্ভ করে। পুলিশ নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের প্রতি প্রবল লাঠি চালনা করিয়া ছত্রভঙ্গ করে। সহরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে জনতা আরও উত্তেজিত হইয়া ওঠে। বিক্ষুব্ধ জনতা রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর কালনা সহরে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে হরতাল প্রতিপালিত হয়। আন্দোলনকারীগণ স্থানীয় পোষ্টাফিস লুণ্ঠন করে; বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত কাশীয়ারা গ্রামের পোষ্টাফিস পোড়াইয়া দেয়। কালনায় অবস্থিত ডাক

বাংলো এবং রেলওয়ে ষ্টেশন অগ্নিসংযোগে ধ্বংশ করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারীগণ কালনার সরকারী আদালত ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ঠিক এই সময়েই বিপ্লবী জনতা বামানিয়া গ্রামের ক্যানাল আফিস এবং জামালপুরের পোষ্টাফিস রেল ষ্টেশন, আবগারী দোকান, থানা প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। বর্দ্ধমান কালনা রোডে অবস্থিত নবস্থা পোষ্টাফিসও আক্রান্ত হয়। সমগ্র বর্দ্ধমান অঞ্চলে আন্দোলন অনেকদিন স্থায়ী ছিল।

বোলপুরঃ—কবিগুরুর তপোবনে বিপ্লব বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; ছাত্র ও ছাত্রীগণ সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া জনগণের নিকট মহাবিপ্লবের বাণী পৌছাইয়া দেয়। ২৯শে আগষ্ট হিন্দু, মুসলমান ও স্থানীয় সাওতালগণ বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। পুলিশ আক্রমণকারী জনতার উপর গুলী চালনা করে; ফলে সরকারী হিসাবমতে সাত জন আহত হয়। আন্দোলনকারীগণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংশ করে।

বিপ্লবের জন্মভূমি বাংলা দেশকে ধ্বংশ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীগণের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে, তথাপি বুভুক্ষু বাংলা, রোগ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত বাংলা তাহার স্বদেশিকতার মন্ত্র আজিও ভোলে নাই। যদিও আগষ্ট বিপ্লবে জাতীর জীবনে স্বাধীনতা আসে নাই, তথাপি বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী হতাশ হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেছে ততদিন তাহারা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মহাবিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। সে বিপ্লব সমাগত। এই বিপ্লবের হোমানলে চরম আত্মাহুতীর জন্য জাতির প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আসাম

অসমীয়া জাতীয় সঙ্গীত

অ মোর আপোনার দেশ।
অ মোর চিকুনি দেশ।
এনেখন সুবলা
এনেখন সুফলা
এনেখন মরমর দেশ ॥
অ মোর সুরীয়া মাত।
অসমর সুবাদী মাত।
পৃথিবীর কতো
বিচারি জনমটো
নো পোবা করিলেও পাত ॥
অ মোর ওপজা ঠাই
অ মোর অসমী আই
চাই লওঁ তোমার
মুখনি এবার
হেপাহ মোর পলোবা নাই।
অ মোর আপোনার দেশ।
অ মোর চিকুনি দেশ।

বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আসামও জাগিয়া উঠিল, আসামের গ্রামে ও সহরের পল্লীতে পল্লীতে বিপ্লব এবং সেই সঙ্গে সরকারী দমন নীতি

যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার সম্যক ইতিহাস লিপিবদ্ধ না হইলেও, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় যতখানি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

শ্রীযুত বড়ুয়া, আগষ্ট বিপ্লবে আসামে যে নূতন গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছে তাহার একটি বিবরণীতে বলেন, ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব ভারতের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ। ম্যাক্সওয়েলী চাতুর্য্য ও টটেনহামের কংগ্রেসের দায়িত্ব সত্ত্বেও উহা ইতিহাসে জনযুদ্ধই থাকিয়া যাইবে। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গেই উহার একমাত্র তুলনা চলে। তীব্রতা, প্রচণ্ডতা ও ব্যাকুলতায় উহাকে বিপ্লবের রূপ দিয়াছে। এই বিপ্লবের তথ্য এখনও সমস্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ভিক্টর হিউগো ফরাসী বিপ্লবের যে ছবি আঁকিয়াছেন, এই বিপ্লবে সেই ছবিই মিলে। ১৯৪২ সালের আগষ্টে যে গণ-অভ্যুত্থান দেখা গিয়াছে, ভারতে কখনও এ-প্রকার প্রাণোচ্ছাশ জীবনের সন্ধান মিলে নাই।

লর্ড লিনলিথগো মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসারকে বলিয়াছেন, 'এখানকার মত এত বৃটিশ-বিরোধীভাব ভারতে কখনো হয় নাই, কোন বৃটিশ প্রতিনিধিও জাতির অনুভূতি এমনভাবে বুঝেন নাই। ভারতের নরনারী বুকের রক্ত দিয়া যে দেশপ্রীতির সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে, আগষ্ট বিপ্লব তাহারই ব্যঞ্জনা। ভারতের বুভুক্ষু উলঙ্গ জনগণের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্পই এ বিপ্লবে প্রকাশ পাইয়াছে।

গণ-অভ্যুত্থান—১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের দিকে সমগ্র জাতির দৃষ্টি পড়িয়া রহিয়াছিল। বৃটিশ সরকার সত্যিকারের জাতীয় গভর্নমেণ্ট ব্যতীত ক্রীপস প্রস্তাব দিয়া ধোঁকা দিবার মতলব আঁটিয়া জনগণের মনে যে তিক্ততা

ও ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল, জাতির প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস, জনগণের সেই অব্যক্ত বেদনাকে ভাষা দিয়াছিল। বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ভারতের দাবী পূরণে অসম্মতিতে তিক্ত গণ-মানস যেন বারুদখানায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধি-বেশনকালে ভারতের জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দকে অতর্কিতভাবে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার এই আগুনে ইন্ধন জোগাইল। নেতৃশূন্য অবস্থায় ভারতের জনগণ তাহাদের এই তীব্র ক্ষোভের যে প্রকাশ দেখাইল, ভারতের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম বীর মণিরাম দেওয়ানের ভূমি আসাম ১৯৪২ সালের বিপ্লবে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

বোম্বাইতে নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই আসাম কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা তায়েবুল্লা, মিঃ ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধি, শ্রীযুত ডি শর্মা সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বোম্বাই হইতে ফিরিয়া ধুবড়িতে গাড়ী হইতে নামিলেই শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ ও শ্রীযুত এস শর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর ব্যাপক ভাবে ধর-পাকড় চলিতে থাকে। আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারী মাতব্বরী সুরে বলেন যে, এই গ্রেপ্তারের ফলে আসামের অবস্থাকে আয়ত্তে রাখা গিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য জনমনের স্বাভাবিক প্রকাশকে বাধা দেওয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দেশে নেতাদের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী তখন এই যুদ্ধের গতিপথে জননেতাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এই গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল ; ভারতে বৃটিশের এই পেষণ-যন্ত্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য জনগণ

দৃঢ়বদ্ধ হইল। সহর হইতে যখন লোকজন গ্রামে এই সংবাদ লইয়া গেল, তখন দেখিল যে, গ্রামবাসীরা 'কর বা মর' রণধ্বনি লইয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

থানা আক্রমণ—ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতীক থানা বা ফাঁড়িগুলির উপরই আন্দোলনের গতিবেগ প্রধাবিত হইল। এই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রবহীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কল্পনাও আসিল। শান্তি শৃঙ্খলার তথাকথিত অভিভাবকদের বুলেট বেওনেট চালানো সত্ত্বেও আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবেই পরিচালিত করা হইয়াছিল। বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু জনগণ অহিংসাকে ত্যাগ করে নাই, অস্ত্রশস্ত্রহীন অহিংস জনতার দরং জেলার গোপুর, বেহালী, ঢেকিয়া থানা আক্রমণ সত্যই এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ পুরুষ-নারী, বালক-বালিকার জাতীয় পতাকাশোভিত শ্রেণীবদ্ধ শোভাযাত্রা বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে কয়েক মাইল দূর হইতে আসিয়া থানা দখল করিত এবং জনগণের স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা করিত। বিদেশী সরকারের গুলী শেষ হইয়া যাইত, সঙ্গীন তাহার শক্তি হারাইত, তবু বিপ্লবী জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা সম্ভব হইত না।

স্বাধীনতার সংগ্রাম ঐকবার সুরু হইলে রক্তাক্ত পিতা হইতে পুত্রে নামিয়া আসে।

অন্যান্য প্রদেশের মত আসামেও আমলাতন্ত্র চরম আঘাত হানিল। ১৯৪২ সালের ১৫ আগষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তারে গোয়ালপাড়ার ছাত্ররা শোভাযাত্রা বাহির করে। পুলিশ সুপার ও মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে পুলিশ, ছাত্র শোভাযাত্রা আক্রমণ করে; লাঠি ও সঙ্গীনের আঘাতের ফলে নয়জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ইহা ছাড়া চারজনকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পুলিশরাজ—আসামে পুলিশ দলকে জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, প্রদেশে অবাধ পুলিশরাজ চলিতে থাকে। তাহারা অসহায় জনগণের উপর অবর্ণনীয় দুঃখ ও নির্য্যাতন অবাধে চালাইতে থাকে। এ সময় স্যার মহম্মদ সাহুল্লার নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরাপত্তার জন্যে আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদিগকে জেলে পুরিতে থাকেন। একজন মন্ত্রী তো আমেরীর কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া স্বাধীনতার আন্দোলন দমন কার্য্যে পুলিশকে বাহবা দিয়াছেন। ইহাতে পুলিশের মাথা আরও গরম হইয়া উঠে এবং তাহারা জনগণের উপর যে অত্যাচার চালায়, তাহার কাহিনী মানুষের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। কনকলতা বা থুলেশ্বরীর হত্যা ছাড়া ১৯৪৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী জোড়হাট জেলের সেলের ভিতরে অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালনায় ১৮১ জন বন্দীকে গুরুতরভাবে আহত করার ঘটনা মানুষের প্রতি মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট জীবের অমানুষিকতার এক কালিমালিপ্ত দৃষ্টান্ত।

নিরস্ত্র জনগণের উপর পুলিশ ও সৈন্যদের আক্রমণ, সরকারী কর্ত্তাদের খুসীমত পাইকারী জরিমানা আদায় এবং নোকরতন্ত্র যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে। জনগণের উপর বৃটিশের কোনই অধিকার নাই—এই ধারণা জনগণের মনে গভীরভাবে দেখা দেয়। আসাম বৃটিশ শাসনে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন, হরতাল পালন ও সভা করিয়া তাহাই বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করে। প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক লোকই এই সকল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। সহর পল্লী কিছুই বাদ পড়ে নাই, ছাত্ররা পড়া ছাড়িয়া পল্লীতে পল্লীতে ঢুকিয়া পড়ে।

নারী শহীদ—১৯৪২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দরং জেলার গোপুরে থানার বাড়ীতে জনগণ পতাকা উত্তোলন করিতে চাহিলে পুলিশ গুলী চালায়। পুলিশের গুলীতে তরুণী কনকলতা নিহত হয় ও বহুলোক আহত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদের গৌরবময় আসনে বরাহবাড়ীর এই বীরাঙ্গনার নাম চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। কনকলতার নেতৃত্বে অগণিত সহস্র সহস্র নরনারী-শিশুর এই বিরাট শোভাযাত্রা অগ্রসর হইলে পুলিশ বাধা দেয়; তখন কনকলতা পুলিশকে জানায় যে থানা বা গবর্ণমেণ্টের লোকরা জনগণেরই ভৃত্য সুতরাং বিদেশী শক্তির চাকুরী করিবার তাহাদের কোন নৈতিক অধিকার নাই। এই সময় পুলিশ তাহাকে গুলী করিবে বলিয়া হুমকী দেয়। এই বীর নারী তদুত্তরে বলেন, তোমরা তোমাদের কাজ করিতে পার, আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিব। ইহার পরেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে জাতীয় পতাকা লইয়া কনকলতা অগ্রসর হইলে পুলিশ গুলী চালায়, মহীয়সী নারী কনকলতার লাল রক্তে আসামের প্রান্তর রঞ্জিত হইয়া ওঠে। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কাওতি নামক অপর এক যুবক কনকলতার হস্তস্থিত পতাকা লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলে তাহাকেও গুলী করা হয়, সেই গুলীতেই ঘটনাস্থলেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অন্যান্য শোভাযাত্রীগণের বাহুতে, দেহের বিভিন্ন অংশে গুলী প্রবেশ করে। এইভাবে বেপরোয়া গুলী চলিবার পরও একদল স্বেচ্ছাসেবক থানার দালানের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল তাঁহার অদৃষ্টকে ভাসাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া না দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁহার বিরাট বাহিনী ভারতে মজুদ রহিয়াছে, তাহারা জাগ্রত

জাতির স্বাধীনতার আগুন নিভাইতে পারিবে। ভারতের পূব-সীমান্তে অবস্থিত আসাম যুদ্ধাঞ্চল, এখানে শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ছাড়া তাহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা চা-করর়াও রহিয়াছে, তাহারাও জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার জন্য উৎসাহের সহিত নিজেদের নিয়োজিত করে। গোপুর থানায় গুলী চালনার পর উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী শ্বেতাঙ্গরা শুধু পিস্তল আর বন্দুক লইয়া ঘুরিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা চা-বাগানের শ্রমিকদিগকে লাঠি এবং রামদাও হাতে দিয়া পুলিশের গুলীতে রক্তস্নাত শোভাযাত্রীদিগকে তাড়া করিতে বাধ্য করিয়াছেন। আর এই শ্বেতাঙ্গরা 'তোম লোক গুণ্ডা হ্যায়, তোম লোক গুণ্ডা হ্যায়' বলিয়া ধ্বনি করিতেছিল। ইহাই অদৃষ্টের চরম পরিহাস। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধারা বিদেশী শোষণকারীদের কাছে, ভারতের স্বাধীনতাহরণকারীদের কাছে, ইন্দোনেশিয়া-ইন্দোচীনের সংগ্রামের বীর সৈনিকদের ধ্বংসকারীদের নিকট 'গুণ্ডা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

তেজপুর হইতে ১৬ মাইল দূরে পার্বত্যজাতি ও চা-বাগানের শ্রমিক অধ্যুষিত ঢোকাইজুলি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লবের শহীদ শ্রীকৌশল কনবরের বেদনাময় স্মৃতি বহন করিবে। ১৯৪২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দশ হাজার নরনারীর এক শোভাযাত্রা থানার বাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে থানার দিকে যাত্রা করে। পুলিশ বেপরোয়া গুলী ফলে চালায়; ফুলেশ্বরী নাম্নী একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাসহ ২০ জন গুলীতে নিহত হয়। এই গুলী বৃষ্টির মধ্যেই একজন স্বেচ্ছাসেবক থানার দালানের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তাহাকে তখনই গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ কেবল সৈন্য বাহিনীই ডাকিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ও ভিন্ন প্রদেশাগত দুর্বৃত্তদিগকে জনগণের উপর লেলাইয়া দিয়াছিল।

তাহারা এই নিরীহ পার্বত্য জাতি ও চা-বাগানের শ্রমিকদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কে মসীলিপ্ত করিয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলার অধিনায়কগণ থানার পিছনে এই গুণ্ডাদিগকে লুকাইত রাখে পরে তাহারা পার্বত্য জাতি ও শ্রমিক নারীদের উপর গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করে।

বেপরোয়া গুলী—ঘটনার দিন বাজার বন্ধ ছিল সহর হইতে আর একদল সৈন্য তলব করিয়া আনা হয়। তাহারা বাজারের লোকদিগকেই কংগ্রেসের শোভাযাত্রী মনে করিয়া বেপরোয়া গুলী চালাইতে থাকে। নারীদের উপর অত্যাচার করিতে থাকে। অসহায় লোকের উপর বৃটিশ সৈনিকদের এই গুলীবর্ষণে ঘটনাস্থলেই ১৬ জন নিহত ও শতাধিক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। নিহতদের মধ্যে তিনজন নারী ছিলেন। তাহাদের একজন অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। ঢেকাইজুলী হাসপাতালে সৈন্য প্রবেশ করিয়া একজন গুরুতর পীড়িত ব্যক্তিকে, কংগ্রেসসেবী মনে করিয়া তাহার বুকে রিভালবার ধরিলে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিলে সে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

২১শে তারিখে তেজপুর সহরে এই ঘটনার বিবরণ পৌঁছিলে ঢেকাইজুলী ও গোপুরে পুলিশ ও মিলিটারীর কার্যের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে জনসভা আহবান করা হয়। সহরে প্রবেশের চারিদিকে রাস্তা পুলিশ আটক করিয়া রাখিলেও টাউন ময়দানে কয়েক জন লোক সমবেত হয়। জনতার উপর লাঠি, সঙ্গীন ও গুলী নির্বিচারে চালান হয়। সেইদিন স্বদেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীর রক্তে সহরের প্রান্তর রঞ্জিত হইয়া উঠে। অত্যন্ত কম করিয়া ধরিলেও শতাধিক ব্যক্তি সেদিনও গুরুতরভাবে আহত হয়।

পাট চারকুচ থানার জোলাছোট গ্রামে ২৫শে সেপ্টেম্বর এক সভা হয়। সভার শেষে গ্রামবাসীরা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন এক দারোগা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইতে বলে। গ্রামবাসীরা এই অবমাননাকর আদেশ মানিতে অস্বীকার করিলে পুলিশ গুলী চালায়। গুলীতে বজালী হাই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমদনচন্দ্র বর্মণ ও সাদারী গ্রামের শ্রীরামতারণ দাস নিহত হয়। দারোগা থানায় ফিরিবার পথে আর একদল গ্রামবাসীকে দেখিবামাত্র তাহাদের উপরও গুলী চালাইয়া কয়েকজনকে আহত করে।

নওগাঁ, দরং ও কামরূপে শহীদের রক্ত নদী বহিয়া গিয়াছে। বালক-বালিকা ও নিরীহ জনগণের শৃঙ্খলিত মাতৃভূমির মুক্তির দাবীই আমলা-তন্ত্রের কাছে অপরাধের এবং সেই অপরাধেই তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে।

বিমানঘাঁটি আক্রমণ—১৯৪২ সালের ২৬শে আগষ্ট কামরূপ জেলার সোরভগ বিমানঘাঁটি আক্রমণ গণশক্তির স্বাধীনতালাভের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষাই প্রমাণিত হইয়াছে। জনগণ মিলিটারী গাড়ী আক্রমণ করে। বাংলো ও কতকগুলি কোয়ার্টারে আগুন ধরাইয়া দেয়। সরকারী ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষাধিক টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

নওগাঁওতে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়াছিল তীব্রভাবে এবং পুলিশের জুলুমও হইয়াছিল চূড়ান্ত। সৈন্যদিগকে, জনগণকে দমনের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল।

২০শে আগষ্ট বেবজীয়া সেতুর নিকট সৈন্যরা লুকাইয়া থাকে; পরে হঠাৎ বাহির হইয়া একদল গ্রামবাসীর উপর গুলী চালায়, ফলে দুইজন যুবক নিহত হয়। পরদিন গৌহাটি হইতে ছয় মাইল দূরে একটি সৈন্য তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার গুলী চালাইয়া একজন যুবককে হত্যা

করে। সৈন্তরা মধ্যরাত্রে বেবজীয়া গ্রামে হানা দেয় এবং নিরীহ নারী পুরুষ ও শিশুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। পরদিন তাহারা উক্ত গ্রামের চারিশত লোককে হাঁটাইয়া নয় মাইল দূরস্থ থানায় লইয়া আসে। তিনদিনের শিশুসহ একজন মহিলাকে তাহারা টানিয়া লইয়া আসে ; শিশুটি পথেই মারা যায়।

বেবজীয়া ও তৎচতুস্পর্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কিছুকাল ধরিয়া পুলিশ ও সৈন্তদের নৈশ-অভিযান চলিতে থাকে, ইহাদের আগমনের খবর পাইলেই সিঙ্গা বাজাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জানাইবার জন্ত শান্তিসেনা প্রহরী মোতায়েন রাখিত। একদিন সৈন্ত দেখিয়া পাহারারত শ্রীযুক্ত তিলক ডেকা সিঙ্গা বাজায়। তিলক ডেকা পুনরায় সিঙ্গা বাজাইতে চেষ্টা করিলে ক্যাপ্টেন নিষেধ করে এবং গুলী করিবার হুমকী দেখায়। তিনি ক্যাপ্টেনের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া সিঙ্গা বাজান, তখন তাঁহার মাথায় গুলী করা হয়। সে গুলীতে তাঁহার মাথা উড়িয়া যায়। গুলীর আওয়াজ শুনিয়া ঐ গ্রামের বহু নরনারী ছুটিয়া আসে ; সৈন্তগণ বেপরোয়া গুলী ও সঙ্গীন চালাইয়া, ৫।৬ জন লোক গুরুতরভাবে আহত করে। জনতা তিলক ডেকার মৃতদেহ কুড়াইয়া লইয়া যায়। পর দিন তিনশতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদিগকে পুলিশ ও সৈন্তরা লাথি মারে এবং বেদম প্রহার করে। একজন বৃটিশ সেনানীর নির্দ্দেশে, শান্তিসেনা শিবিরে হানা দিয়া উহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে প্রহার করা হয়। একজন শান্তিসেনা প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে সৈন্তগণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে।

রোহা হাই স্কুলের বাড়ীতে ৫।৬ বৎসর যাবৎ জাতীয় পতাকা উড়িতেছিল, ছাত্ররা স্কুলে আসে না, শুধু শিক্ষকগণ রহিয়াছে ; একদিন একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক সেখান দিয়া যাইতেছিল, পতাকা দেখিয়া শিক্ষক-

দিগকে তাহা ফেলিয়া দিতে বলিলে শিক্ষকরা অস্বীকার করেন, তখন শ্বেতাঙ্গটি তাহাদিগকে অমানুষিকভাবে প্রহার করে। এ প্রকার সৈনিকগণের স্বেচ্ছাচারিতার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বৃদ্ধাকে গুলী—১৬ই সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার পাঁচ মাইল দূরস্থ এক স্থানে কংগ্রেস অফিসের সম্মুখে বহু নারী, পুরুষ ও শিশু সমবেত হয়। পুলিশ ও সৈন্যরা তথায় আসিয়া জড় হয় এবং মেয়েদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইয়া যায়। শ্রীযুক্তা ভোগেশ্বরী ফুকুনানী নাম্নী এক বৃদ্ধ মহিলার নাতনী শ্রীমতী রত্নমালা নাম্নী এক রমণীর হাত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইবার সময় জনৈক সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়, ইহাতে বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া সার্জ্জেণ্টকে পতাকাদণ্ড দিয়া আঘাত করে। তখনই সার্জ্জেণ্ট শ্রীযুক্তা ভোগেশ্বরীকে গুলী করে। তৎক্ষণাৎ জাতীয় পতাকাহস্তে এই মহিয়ষী নারীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

জনতা উপস্থিত নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলে সৈন্যরা তাহাদের উপরও নির্ম্মমভাবে গুলী চালায়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীরাম হাজারিকা এবং শ্রীযুক্ত থানুরাম সুত ও বালুরাম সুত নামক দুই ভাই সৈন্যদের গুলীতে নিহত হয়। লক্ষ্মীরামের নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার পকেট হইতে শেষ ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া জনতার হাতে দেশের জন্য দিয়া যান। এই বীরের রক্ত ও মুদ্রা জাতীয় সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। মাতৃভূমির দাসত্বের জিঞ্জিরে যে জঞ্জাল জন্মিয়াছে সে জঞ্জাল অপসারণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন বলিয়া এই মহান্ বীরের পত্নী গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। জনতা সারা রাত্রি মৃত বীরদিগকে ঘিরিয়া রাখে, পরদিন জাতীয় বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শোভাযাত্রা বাহির করে।

আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে

বন্দী করা হয়। জোড়হাট ও শিবসাগর মহকুমায় আদালত ও সমুদয় সরকারী অফিসের সন্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ছাত্ররা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অফিসে যাইতে নিষেধ করে। কর্ত্তৃপক্ষ শিশুদের গ্রেপ্তার করিয়া বন্য শ্বাপদ সঙ্কুল পাহাড়ে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়।

গ্রাম হইতে সরবরাহ বন্ধ—স্থানীয় এলাকায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়। চারিগাঁও, হাতীগড়, তেওকা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। সৈন্য ও কণ্ট্রাক্টারগণ যাহাতে কিছু না পায়, তজ্জন্য গ্রাম হইতে সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ধান, চাউল প্রভৃতি সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পুলিশ ও সৈন্য গ্রামবাসীদের উপর চূড়ান্ত জুলুম আরম্ভ করে। বেপরোয়াভাবে লাঠিও সঙ্গীণ চালায় এবং গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচারে জোড়হাটের পঞ্চাশ জন কর্ম্মীর চিরকালের মত অঙ্গহানি হয়।

তেওকার স্থানীয় সৈন্যদিগকে ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জিনিষপত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। একদিন তিন সহস্রাধিক লোক কংগ্রেস অফিসে সমবেত হয়। পুলিশ ও সৈন্যরা জনতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং লাঠি ও বেয়নেট বেপরোয়াভাবে চালাইয়া বহু নারী, পুরুষ ও শিশুকে গুরুতরভাবে জখম করে। মহিলাদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। তাঁহারা পুলিশ ও সৈন্যদের লাঠি ও সঙ্গীনের খোঁচা সত্ত্বেও জাতীয় পতাকার সন্মান অক্ষুন্ন রাখেন। প্রায় ২০।২৫ জন নারী ও পুরুষ সৈন্যদের অক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর শিবসাগর সহরে প্রবেশের সকল দ্বার বন্ধ করা সত্ত্বেও পনর সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। বাঘের মত হিংস্র পুলিশ ও সৈন্যরা শান্ত জনতার উপর লাফাইয়া পড়ে ও নির্ব্বিচারে সঙ্গীন চালাইয়া কুড়ি জন লোককে গুরুতরভাবে আহত করে।

ধ্বংসাত্মক কার্য্য—গবর্ণমেণ্ট যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ফলে আন্দোলন গুপ্তপথে চলিয়া যায়। নির্যাতনে ক্ষুব্ধ জনগণ বীরত্বের সহিত সরকারী শক্তির সম্মুখীন হয়। তাহারা (১) পুলিশ ও সৈন্যদের চলাচলের রাস্তাঘাট ধ্বংস করিয়া দেয়, (২) রেল-লাইন তুলিয়া ফেলে, (৩) আদালত বাড়ী ধ্বংস করে, (৪) জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। জনগণ ব্রিটিশের শক্তির প্রতীক প্রতিষ্ঠান সমূহ নষ্ট করে। ছাত্রগণ কেবল স্কুল ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য 'মৃত্যুকামী বাহিনী' গঠন করে। নবেম্বর মাস হইতে ডাক-বাংলো, ইনস্পেক্শন-বাংলো, পোষ্ট-অফিস, পি ডবলিউ ডি অফিস সৈন্য-নিবাস, বিমানঘাঁটি প্রভৃতি ধ্বংস কার্য্যের উপরই জোর দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, ছয় স্থানে ট্রেন ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৬শে নবেম্বর গৌহাটী হইতে ১৪ মাইল দূরে সৈন্য বোঝাই ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়। সরুপাথরের সৈন্যদের মাল বোঝাই গাড়ী ধ্বংশ করা হয়। আন্দোলন কারীগণ টেলিগ্রাফ অফিস, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বোমা নিক্ষেপ করে। গান্ধীজির সহিত বড়লাটের যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, সেইগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্তই এসকল কাজ চলিতে থাকে। আসামের বিপ্লব যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। চারি মাস বে-সামরিক গবর্ণমেণ্ট অচল হইয়া রহিয়াছিল। পুলিশ ও সৈন্যরা শুধু বিপ্লবের প্রধান প্রধান ঘাঁটি লইয়াই ব্যস্ত ছিল।

বীর অহমরা আসাম কংগ্রেসের এক শক্তিশালী অংশ। এই অহমরা ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব্বে ছয়শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাহাদেরই একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত কৌশল কোনবর। তিনি কংগ্রেসের আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং জনগণের নিকট কংগ্রেসের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন। সরুপাথর রেলগাড়ী ধ্বংস মামলার রাজসাক্ষী তাঁহাকে জড়িত করে।

সরকারী রাজসাক্ষীর উক্তির ফলে এই দেশপ্রেমিক পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেশমাতৃকার বেদীমূলে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর জীবনদান জাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ফাঁসীরজ্জু গলায় তুলিবার পূর্বে তিনি বলিয়াছেন, "যে জন্মে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ভগবান আমাকেই এই গৌরবের অধিকার দিয়াছেন বলিয়া আমি সুখী। ভগবান আমায় ভালবাসেন।" স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁহার জীবনদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি "পার কর দীননাথ সংসার সাগর"—এ প্রার্থনা-সঙ্গীত করিতে করিতে ফাঁসীর রজ্জু গলায় পরেন।

অহম্ কর্ম্মীর জীবনাবসান—আসামে পার্বত্যজাতিভুক্ত মিরি সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত কমলা মিরি গোলঘাট জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি কংগ্রেস ও গান্ধীজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দিতে বলেন। তিনি অস্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আট মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি জেল-জীবন সহ্য করিতে পারেন না এবং গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। সরকার তাঁহাকে আন্দোলনে যোগদান করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দিতে বলেন, তিনি ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখান করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও কর্তৃপক্ষকে বলেন,—

"আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই দুঃখ আমি গ্রহণ করি নাই, দেশের সমগ্র জনগণের জন্যই এই পথ গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে বলিতেছেন কেন?"

কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরেই এই দেশপ্রেমিকের জীবনাবসান হয়।

পাইকারী জরিমানা—সরকার নিরীহ জনগণের উপর পাইকারী

জরিমানা ধার্য্য করেন। সরকারী হিসাবেই বলা হয়, শ্রীহট্ট জেলায় ২০০০৲, লখীমপুর জেলায় ১০,০০০৲, শিবসাগর জেলায় ৪৭৫০০৲, দরং জেলায় ৪২২০০৲, কামরূপ জেলায় ৭০৫৮৭৲ ও গোয়ালপাড়া জেলায় ১৫০০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল। সরকার এই হিসাবও অত্যন্ত কম করিয়া দেখাইয়াছেন। এই হিসাবের সহিত অন্ততঃ আরও ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা যাইতে পারে। সরকার এই টাকা আদায়ের জন্য জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহারা দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া নারীদিগকে অপমাণিত করে দরিদ্রের বাসন ও অন্যান্য তৈজসপত্র প্রভৃতি লইয়া যায়।

জরিমানা আদায়ের জুলুম—আসাম পরিষদে শ্রীযুক্ত রোহিনী-কুমার চৌধুরী একটি ঘটনা উত্থাপন করেন এবং প্রধান মন্ত্রী স্যার সদুল্লা উক্ত ঘটনার বিষয় স্বীকারও করেন; তাহা হইতেই পাইকারী জরিমানা আদায়ের একটা নমুনা মিলিবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন—

"শ্রীনিধন রাজবংশী সম্পর্কিত ঘটনার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোকিয়া গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছে। উক্ত গ্রামের নিধন রাজবংশীর উপর ধার্য আট টাকা আদায়ের জন্য একজন কনেষ্টবল যায়। লোকটি টাকা দিতে অসমর্থ হইলে কনষ্টেবল তাহার হালের একজোড়া বলদ লইয়া চলে। রাজবংশী বলে যে, এই দুইটিই তাহার হালের বলদ এবং ঐগুলিকে লইয়া যাইতে নিষেধ করে। ইহাতে কনষ্টেবল তাহাকে গালাগালি করে এবং লাঠি দিয়া মারধর করিয়া চলিয়া আসে। লোকটি কনষ্টেবলকে দাও দিয়া আঘাত করে নাই, কারণ কনষ্টেবলের গায়ে তাহার কোন চিহ্নই ছিল না এবং দিনের বেলায় এই ঘটনা হয়।

"রাত্রি ২২টায় মহকুমা হাকিম ধুধানী হইতে ফিরিয়া এই রিপোর্ট

পায় এবং দুই জন শ্বেতাঙ্গ অফিসার সহ দুই লরী বোঝাই সশস্ত্র সিপাহী লইয়া রাজবংশীর বাড়ীতে যায়। হাকিম যাইয়া দেখে যে, লোকটি ঘরের ভিতরে আছে ও একটি বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে আদেশ করে। লোকটি আদেশ অগ্রাহ্য করে, তখন ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়া মহকুমা হাকিম গুলীর আদেশ দেয়। একজন শ্বেতাঙ্গ গুলী ছোঁড়ে, ছয়বার গুলী করা হয়, লোকটির হাঁটুর সন্ধিস্থলে গুলী প্রবেশ করে এবং তিনি ঘুরিয়া পড়েন এবং অনর্গল রক্ত বাহির হইতে থাকে। দেওয়াল ভেদ করিয়া একটি গুলী ছুটিয়া গিয়া একজন সিপাহীর বুকে বিদ্ধ হয় এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তারপর সিপাহীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বন্য শূকরের মত লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া লোকটিকে হত্যা করে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ দুই জনের মৃতদেহই লইয়া আসে। লোকটির মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছাদাগারে প্রেরণ করে এবং সিপাহীর মৃতদেহ সম্মান দিয়া কবরস্থ করে। এই বিবরণই আমি পাইয়াছি"।

এই প্রকার কত ঘটনা হইয়াছে। যে মহকুমা হাকিম এই ঘটনার জন্য দায়ী তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছে।

আসামের বিপ্লবের ইতিহাসে গৌরবমণ্ডিত। সমগ্র প্রদেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, সর্বত্র মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কামান, পিস্তল ও বুলেটের মুখে জনগণ বিপ্লবের পতাকা বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহারা-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। আসামের নরনারী সাহস ও বিশ্বাসের সহিত এই বিপ্লবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। আসাম শুধু জয়মতীর বন্দিত ভূমি নহে, কনকলতা ভোগেশ্বরীর আত্মোৎসর্গে পূত ভূমি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। আসাম

লচিতফুকন, মনিরাম দেওয়ান, কৌশল কনবর ও তিলক ডেকের জন্মভূমি। এ মৃত পৃথিবী হইতে যে নবশক্তির উন্মেষ দেখা যাইতেছে সেই পৃথিবীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আসাম গৌরবময় আসন গ্রহন করিবে—বিধাতাপুরুষ ইহা নির্ধারিত করিয়াছেন।

আসাম আগষ্ট বিপ্লবের সহীদ কনকলতা, থুলেশ্বরী, ভোগেশ্বরী, লক্ষ্মী হাজারিকা, তিলকডেকা, থান্থরাম, বালুরাম, কৌশল-কনবর, কমলামিরি, নিধন রাজবংশীকে ভুলিতে পারে না। অগণিত শহীদের রক্তে আসাম পবিত্র। দেশের জন্ম আত্মদানকারী এই বীরগণ আসামের জনগণকে ডাকিতেছেন। জনগণ কি সাড়া দিবে না?

জয় হিন্দ

ভারতের বাহিরে আজাদ-হিন্দ সেনাবাহিনীর মুক্তি সংগ্রামের
একমাত্র প্রামাণিক সুবৃহৎ সচিত্র ইতিহাস

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

আজাদ-হিন্দ ফৌজ

প্রথম খণ্ড

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৭টি এক বর্ণ চিত্র ও ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট সম্বলিত

কয়েকটি অভিমত :

"The success of this book as a best seller is indicated by its running into two editions within two months. The author has sifted all the available materials and has given a good running story of this most gigantic effort at liberation of India since the revolt of 1857. The book is well illustrated and has undergone considerable additions and alterations in the second editions".

—Amrita Bazar Patrika.

"The second editions of the book shows that this book has gained an immense popularity. It is an inspining document of the struggle for Indian freedom". —Hindusthan Standard

"এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ সংকলনে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "আজাদ-হিন্দ ফৌজ" সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র কৌতূহল আছে তাহারা বইখানি পড়িয়া খুসী হইবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাকে আরও তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও অধিক সংখ্যক চিত্র শোভিত করা হইয়াছে। —যুগান্তর

"দেখতে দেখতে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুলো। দেশগৌরব নেতাজী ও তাঁর স্বাধীনতাকামী মুক্তি সেনা সংক্রান্ত যতগুলি বই এ যাবৎ বেরিয়েছে, তারিণী বাবুর সম্পাদিত এই বইখানি সবচেয়ে প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ হয়েছে। —বসুমতী

দাম আড়াই টাকা

প্রাপ্তিস্থান—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়